সুমন্ত আসলাম

তুমি রবে নীরবে

SUPERIOR SUNY

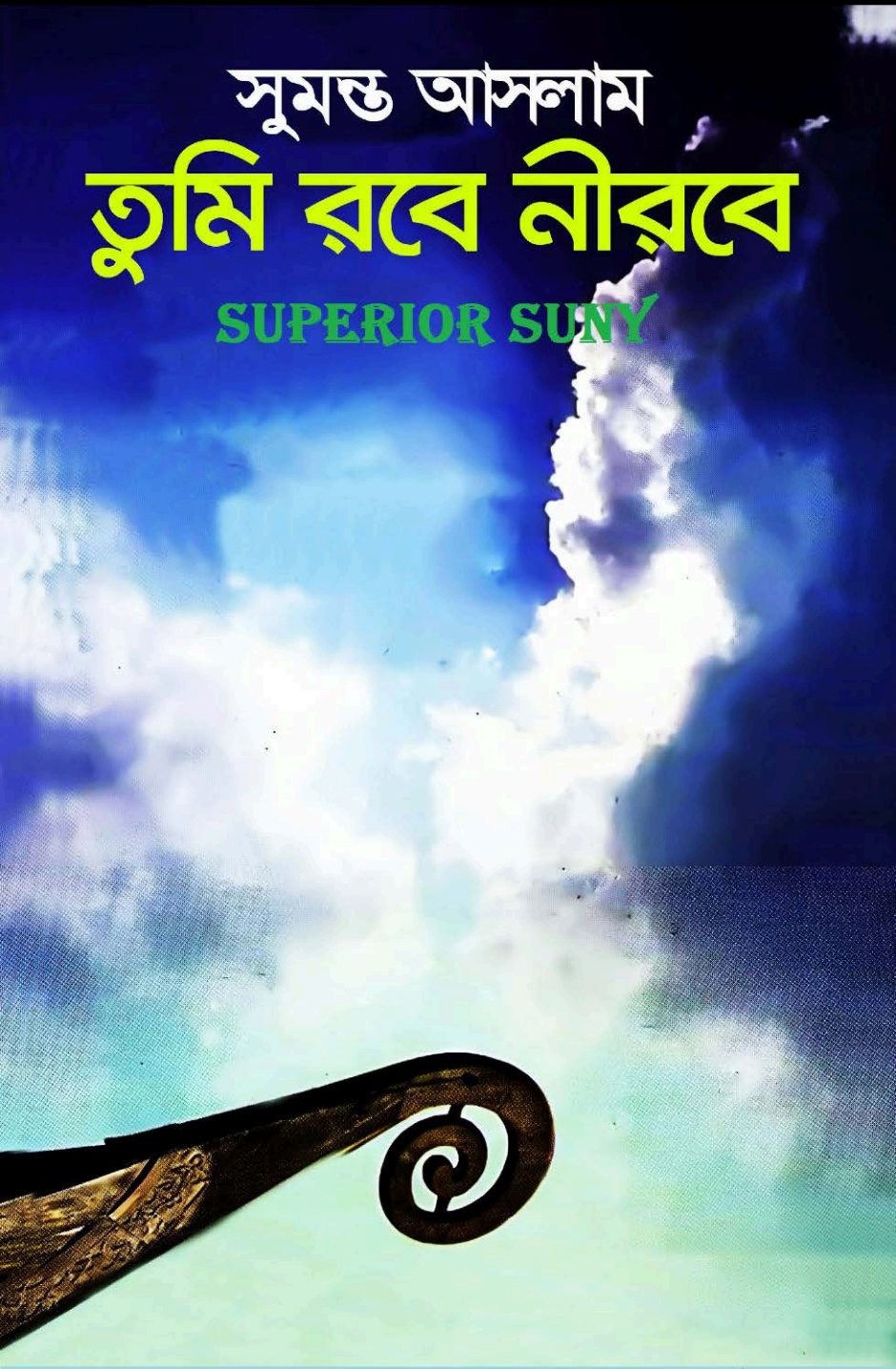

BOILOVERS.COM

ভালোবাসাবাসির ক্ষেত্রে সাধারণত এটাই হয়— একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে, ওই মেয়েটা আবার অন্য একটা ছেলেকে ভালোবাসে।

কিন্তু ভালোবাসার এ উপন্যাসের ঘটনাটা অন্যরকম।

ঘটনাটা হলো— দীপ্র একটা মেয়েকে ভালোবাসে, মেয়েটার নাম প্রেমা। কিন্তু প্রেমা দীপ্রকে ভালোবাসে না।

ঘটনাটা এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। তারপরের ঘটনা হচ্ছে— প্রেমা আসলে কাউকেই ভালোবাসে না এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে কাউকেই ভালোবাসবে না।

কিন্তু দীপ্র তাকে ভালোবেসেই যায়। এবং এই ভালোবাসতে বাসতেই একদিন জেনে যায় প্রচণ্ড কষ্টলাগা এক ঘটনা।

একটা মেয়ের জীবনে এত গোপন কিছু হয়, এত মর্মস্পর্শী গল্পও থাকে!

প্রচ্ছদ মাসুম রহমান

তুমি রবে নীরবে

সুমন্ত আসলাম

অন্যপ্রকাশ

তৃতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৬
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৬

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১০০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Tumi Robe Nirobe | By Sumanta Aslam
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 100.00 only
ISBN : 984 868 394 1

বইমেলায় একবার এক ভদ্রলোক খুব আন্তরিকভাবে আমাকে হঠাৎ বললেন, 'তোমার নাম তো সুমন্ত, না ?'

আমি বললাম, 'জি।'

'তোমার লেখা আমি খুব পছন্দ করি, আর তোমার বই খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে মেলায়।'

'জি।'

আন্তরিকভাবে তিনি আবার বললেন, 'আমার হৃদয় থেকে তোমাকে দোয়া করি, ভগবান তোমার আরো ভালো করুন।'

পরের বইমেলায় তার সঙ্গে আমার দেখা। তিনি আগের বইমেলার চেয়েও আরো আন্তরিকভাবে বললেন, 'সুমন্ত, তোমার কথা আমি সবাইকে বলি, তোমার প্রশংসা করি। আমি আমার বুকের ভেতর থেকে তোমাকে দোয়া করি, স্রষ্টা তোমার মঙ্গল করুন।'

প্রিয় প্রণব ভট্ট, প্রিয় প্রণব'দা

মানুষকে প্রশংসা করার আত্মা বা হৃদয় সবার থাকে না, আপনার আছে। সে আত্মাটা অনেক বড়, অ-নে-ক বড়!

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে দীপ্র, কথাটা আজ সে বলবেই। যত অসুবিধা হোক, যত সংকোচই আসুক, যত বাধাই মনে হোক না কেন, কথাটা আজ সে বলবেই। আজ মনের সকল অস্বস্তি দূর করবেই।

'কী ভাবছ ভাইয়া ?'

ভাবনায় ছেদ পড়তেই দীপ্র একটু বিরক্ত হলো। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ পেল না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অরকীয়া পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

'কই না তো, কিছু ভাবছি না।'

'মিথ্যে বলছ কেন ? দিব্যি দেখতে পাচ্ছি কিছু একটা ভাবা হচ্ছে।'

'কোনো অসুবিধা আছে ?'

'না। তবে ভাবনার বিষয়টা জানতে পারলে ভালো লাগত।'

'সব কিছু জানতে হয় না।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ। সবজান্তা হলে অনেক অসুবিধা। বেশিরভাগ সবজান্তাদের কপাল ফাটে।'

কথাটা শুনে অরকীয়া বিশেষ এক ভঙ্গিতে দীপ্রর দিকে তাকাল। ইদানীং প্রায়ই সে এমনভাবে দীপ্রর দিকে তাকায়। কিন্তু দীপ্র তেমন একটা পাত্তা দেয় না। এই ভঙ্গিতে তাকানোর বিশেষ একটা মানে থাকলেও দীপ্র অরকীয়াকে শুধু ফুপাতো বোন হিসেবেই জানে। স্রেফ ফুপাতো বোন ছাড়া দীপ্র তাকে অন্য কিছু ভাবতে চায় না। তার চেয়ে মাত্র এক ক্লাস নিচে পড়া এই মেয়েটিকে সে নিতান্ত বাচ্চাই ভাবে। যদিও অরকীয়া এখন কলেজে পড়ছে। একটি মেয়ে তার কৈশোরত্ব পেরিয়ে যখন ধীরে ধীরে নারীত্বের দিকে এগোয়, অরকীয়াও তেমনি এগোচ্ছে। আজকাল অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলতে শিখেছে সে। এটা ওটা সম্পর্কে বুদ্ধি দেয়, তুচ্ছ কারণেও শাসনের ছোঁয়া বুলায়। মাঝে মাঝে চেহারায় গম্ভীর গম্ভীর ভাব নিয়ে আসে এবং নিজেকে সবার চোখে সুন্দর প্রমাণ করার একটা পরিবেশ সে নিজের মাঝে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

মাধ্যমিক পাশ করে দীপ্র যেদিন শহরে তার ফুপুর বাসায় এলো, তখন অরকীয়া যেমন শুধু একটি সাধারণ মেয়ে ছিল, সেও ছিল তেমনি নিতান্তই একজন গ্রাম্য

ছেলে। মোটামুটি স্বচ্ছল এই ফুপুর বাসায় এসে দীপ্র বেশ আরামই বোধ করেছিল। ফুপুর এক মেয়ে এক ছেলে। অরকীয়া আর অর্ক। অর্ক খুব দুষ্টু। ভীষণ পাজিও বটে। দীপ্রও মা-বাবার একমাত্র ছেলে। আর মাত্র দু'বছরের ছোট এক বোন শিলা। শিলা ভীষণ অভিমানী আর জেদি। প্রতি সপ্তাহে তাকে চিঠি লিখতে হবে। কোনো মেয়ের সাথে পরিচয় হলো কিনা, কেউ চিঠি দেয় কিনা, কেউ শিস বাজায় কিনা ইত্যাদি সব জানাতে হবে তাকে।

শহরে এসে কলেজে ভর্তি হলো দীপ্র। ফুপুর বাসায় থাকার বিনিময়ে অরকীয়া আর অর্কের মাস্টার সাজতে হলো তাকে। ভাইবোনের সম্পর্ক ছাড়াও দীপ্রকে তারা শিক্ষক হিসেবে মেনে নেয়। ক্রমশ সহজ-সরল একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে।

'এই, রাগ করলি নাকি ?'

'তাতে তোমার কী ?' অরকীয়ার কণ্ঠে অভিমান।

'রাগলে তোকে হুতোম পেঁচার মতো দেখায়।'

'ভাইয়া, বেশি ভালো হচ্ছে না কিন্তু।'

'তুই খুব বড় হয়ে গেছিস, নারে ?'

'নয়তো কী ? সারাজীবন ছোটই থাকব নাকি!'

'ঠিক তা নয়। তবে তুই আমার কাছে কিন্তু সেই পিচ্চিটাই আছিস।'

অরকীয়া আবার সেই বিশেষ ভঙ্গিতে দীপ্রর দিকে তাকাল। দীপ্র অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ বদলিয়ে বলল, 'আজ কলেজে যাবি না ?'

'না।'

'কেন ?'

'কলেজে যেতে ভালো লাগে না।'

'কেন ?'

'পড়তে ইচ্ছে করে না।'

'তো, কী করতে ইচ্ছে করে ?'

'জানি না।'

'ঘুমোতে ইচ্ছে করে ?'

'না।'

'বেড়াতে যেতে ?'

'তাও না।'

'নাচতে অথবা গান গাইতে ?'

'না।'

'ও বুঝেছি।' দীপ্রর মুখে দুষ্টু হাসি।

কথাটি শুনে কেমন যেন চমকে ওঠে অরকীয়া। চোখ দুটো একটু বড় বড় করে ফেলে। হঠাৎ দীপ্রর একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলে, 'কী বুঝেছ ?'

'আহ-হা, এত জোরে হাত ধরেছিস কেন ? নখগুলোও তো মাশাল্লাহ কোদালের মতো। ইদানীং মেয়েদের কী একটা ফ্যাশন হয়েছে, হাতের নখ বড় রাখা। যত্তোসব। কারো কারো আবার পায়ের নখও বড় রাখার মানসিকতা আছে। দেখে মনে হয়...'

'থামলে কেন, বল কী মনে হয় ?'

'থাক, ওটা আর শুনতে হবে না।'

মাথাটা নিচু করে ওড়নার এক মাথা ধরে এমনি এমনি টানছে অরকীয়া। কতগুলো সুতো টেনে তুলছে, ছিঁড়ে ফেলে আবারও টেনে তুলছে। চোখ দুটো কেমন যেন ভেজা ভেজা। তার কাণ্ড দেখে দীপ্র মিটিমিটি হাসে। হঠাৎ অরকীয়ার একগুচ্ছ চুল টেনে বলল, 'এই পাগলি, কাঁদছিস নাকি ?'

অরকীয়া কোনো কথা না বলে আগের মতোই ওড়নার সুতো টানতে থাকে।

'আমি সব বুঝি রে!'

অরকীয়া এবার ফোঁস করে বলে, 'কী বোঝ ?'

'স-ও-ব।'

'যেমন ?'

'ফুপুকে বলতে হবে।'

ভীষণ চমকে ওঠে অরকীয়া। মাথাভর্তি ছড়ানো চুলগুলো খোঁপা বেঁধে অদ্ভুত এক দৃষ্টি নিয়ে দীপ্রর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী বলবে ?'

'তোর বিয়ের কথা।'

'ভাইয়া, ভালো হবে না কিন্তু।'

'কেন, বিয়ে করবি না ?'

'না।'

'তবে কি মাদার তেরেসা হবি ?'

'না।'

'তাহলে নিশ্চয়ই লাইলি হবি ?'

'তাও না।'

'ঠিক আছে, তোর কিচ্ছু হতে হবে না। আমি একটা রাজপুত্র খোঁজার ব্যবস্থা করছি।'

'সে দায়িত্ব তোমার না নিলেও চলবে।'

'কেন ?'

অর্ক হঠাৎ একটা বই নিয়ে দীপ্রর ঘরে প্রবেশ করে। দীপ্রর কাছে এসে বলল, 'ভাইয়া, দেখতো এখানে ভুল লিখেছে কিনা ?'

'তুই পড়ে শোনা।'

'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।'

'ভুল কোথায়, ঠিকই তো লিখেছে।'

'ঠিক লিখে নি। কারণ ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় না।'

'কে বলল ?'

'আমি বললাম।'

'কী করে বুঝলি ?'

'বাবার ইচ্ছা ছিল, তিনি একজন উকিল হবেন, কিন্তু হয়েছেন চাউলের আড়তদার।'

'ও, এই কথা।' অর্কর ছেলেমানুষি যুক্তি শুনে দীপ্র মনে মনে হাসে।

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় না। সুতরাং বই থেকে এই প্রবাদ বাক্যটা তুলে দেয়া উচিত। আর একটা কথা, 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' এই মিথ্যা কথাটা কেন এখনো লেখা হচ্ছে ?'

'এটা মিথ্যা হতে যাবে কেন ?'

'হবে না মানে ? প্রতি বছর যখন আমাদের দেশের এগারোজন ফুটবল খেলোয়াড় সঙ্গে আরো কয়েকজন অতিরিক্ত খেলোয়াড় ও কর্তাব্যক্তি মিলে কয়েক মণ মধু খেয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রশিক্ষণ নিয়েও বাইরের সাধারণ টিমের সঙ্গে হেরে যায়, তখন আমাদের এত লজ্জা হয় কেন আর পত্রিকাতেই বা লেখে কেন, 'এত লজ্জা রাখি কোথায় ?' এখানে এগারোজনের বদলে ত্রিশ, চল্লিশজন মিলে তো একটা কাজ করা হয়। সুতরাং হারি জিতি লাজ হওয়ার তো কথা নয়।'

'তা সত্য।'

'সুতরাং...।'

'সুতরাং এবার তুমি থাম। আজকাল তুমি একটু বেশি বুঝতে শিখেছ। এটা বন্ধ কর।'

'তাই বলে একটা ব্যাপারে খটকা লাগলে সেটা বলব না?' অর্ক কিছুটা আহত কণ্ঠে বলল।

'বলবে, অবশ্যই বলবে। কিন্তু কখনো তো শুনি নি, অংকে এত কম নাম্বার পাই, এটার একটু পরিচর্যা করা উচিত, কিন্তু কেন?'

'ভাইয়া, তুমি একটু ভেবে দেখ, আসলে অংকের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ অত্যাধুনিক কম্পিউটার আর ক্যালকুলেটরের এই যুগে খাতা-কলমে যোগ বিয়োগ করার কোনো মানে হয় না। আর ঐ জ্যামিতিটা। কী লাভ ঐ ঝামেলাটা শিখে? আমার তো মনে হয়, খুব কম মানুষই জ্যামিতি শিখে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পেরেছে। আচ্ছা তুমিই বল, তুমি কি পেরেছ? তাই ভাবছি, যদি কোনো দিন শিক্ষামন্ত্রী হতে পারি তবে সিলেবাস থেকে অংক তুলে দেব।'

'আচ্ছা, সে না হয় তুলে দেয়া যাবে, কিন্তু কদিন পর যে তোর ম্যাট্রিক পরীক্ষা, সে খেয়াল আছে।'

'থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে।'

'তাহলে এখানে কী জন্য এসেছিস বলে বিদেয় হ।'

'আপা, মা তোকে ডাকছে।' এই বলে মুখভার করে অর্ক রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

দীপ্র একদৃষ্টিতে অর্কের চলে যাওয়া দেখে। নতুন প্রজন্মের ছেলে। নতুন নতুন ভাবনা আর নতুন নতুন কথা।

'অরকীয়া, ফুপু তোকে ডাকছে যে।'

'যাচ্ছি। ভাইয়া তোমাকে একটা কথা বলব?'

'বল।'

'কিছু মনে করবে না তো?'

'মনে করার মতো কোনো কথা নাকি?'

'তা নয়।'

'ঠিক আছে, তোকে বলতে হবে না। আমি বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'তোর কথা। নিশ্চয় বলবি, কোনো ছেলে তোকে বলেছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এখন তুই কী করবি ভেবে পাচ্ছিস না— এই তো।'

'না।'

'তবে ?'

'থাক, বলব না।'

'কেন ?'

'বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'মন খারাপ হয়ে গেল ?'

'নাহ্।' অরকীয়া খুব সাবধানে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু শব্দটি দীপ্রর কান এড়াল না। তারপর অরকীয়া খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'আচ্ছা ভাইয়া, তুমি কলেজের যে গোলগাল মেয়েটার সঙ্গে প্রায়ই কথা বল, কে সে ?'

'গোলগাল!' একটু ভেবে দীপ্র বলল, 'প্রেমার কথা বলছিস ? আমাদের সাথে পড়ে। মেয়েটাকে তোর কেমন লাগেরে ?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো ?'

'ভাইয়া, আমি যাই।'

'কিরে, বললি না কেমন লাগে।'

'ভাইয়া, তুমি অনেক কিছু বোঝ না।'

'তাই বুঝি ?'

অরকীয়া কোনো কথা বলল না। আবার সেই বিশেষ ভঙ্গিতে দীপ্রর দিকে তাকিয়ে চলে গেল। দীপ্র মুচকি একটু হাসতে গিয়েও থেমে গেল। কোনো ভুল হচ্ছে কি ? মনের ভেতর কেমন যেন করছে। অনুভূতিটা আনন্দের না বেদনার, এ মুহূর্তে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বুঝতেও পারছে না।

কলেজের দোতলার করিডরে দাঁড়িয়ে কান্তা, মলি আর প্রেমা আড্ডা দিচ্ছে। খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে ওদের। একজন কথা বলছে তো আরেকজন হাসছে। অন্যজন কথা বলছে তো আরেকজন গড়িয়ে পড়ছে। কলেজে এখনো ছাত্রছাত্রী তেমন আসে নি। দেরিতে ক্লাস থাকা সত্ত্বেও প্রেমা আজ একটু তাড়াতাড়ি কলেজে এসেছে। কারণ কান্তা আসতে বলেছিল। তার সঙ্গে কান্তার নাকি জরুরি কী কথা আছে।

বারান্দা দিয়ে তিনটে ছেলে হেঁটে যাচ্ছে। খুব সাধারণ গোছের ছেলে। মলি হঠাৎ আঙুল দিয়ে একটা তুড়ি বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমা চোখ রাঙিয়ে বলল, 'দেখ মলি, শয়তানি করবি না।'

প্রেমার বান্ধবীদের মধ্যে মলিই সবচেয়ে দুষ্টু। মেয়ে হয়েও ছেলেদের মতো ওর মধ্যে একটা ড্যামকেয়ার ভাব আছে। যেখানে যা বলা প্রয়োজন তা তো বলবেই, যা প্রয়োজন নয় তাও বলবে। কথার মারপ্যাঁচে ওকে হারাতে পেরেছে পুরো কলেজে এখনো এমন কাউকে পাওয়া যায় নি।

'তুই চুপ থাক, একটু মজা করি।' মলি বলল।

'কী দরকার আছে শুধু শুধু ছেলেগুলোকে বিব্রত করা!'

'কোনো দরকার নেই, তবুও করব। কারণ আজকাল ছেলেরা সুযোগ পেলেই মেয়েদের টিজ করে, ওড়না টেনে ধরে, এমনকি গায়েও হাত দেয়। অসহ্য! সুতরাং পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে ছেলেদের একটু ভয় পাইয়ে দিলে নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বরং ওদের বুঝিয়ে দেয়া উচিত মেয়েরাও আজকাল সব পারে।' মলি তার হাত দুটো একটু উঁচু করে কথাগুলো বলল।

'আসলেই কি পারে?' প্রেমার চোখে সন্দেহের একটা আবরণ।

'অবশ্যই। চোখ কান খোলা রাখলেই সব দেখতে এবং শুনতে পারবি। তাছাড়া এমন অনেক ভুরি ভুরি প্রমাণও আছে।'

'তাই বলে সহজ সরল সাধারণ গোছের ছেলেদের বিব্রত করে কী লাভ! ওরা তো নিতান্তই সাদাসিধে। আসল অপরাধী যারা, সেসব বখাটে ছেলেদের তো কিছু বলতে পারবি না। শুধু শুধু এদের পিছে লাগিস।'

'তুই আসলেই একটা বোকা মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষই রয়ে গেলি। মানুষ আর হতে পারলি না। আরে গাধা, তোর ঐ সহজ সরল সাদাসিধে ছেলেগুলোই সুযোগ পেলে তাদের মুখোশটাকে খুলে ফেলে। এসব ভেজা বেড়ালদের আমার চেনা আছে।'

'তুই মনে হয় খুব বেশি চিনিস?'

'অন্তত তোর চেয়ে।'

'মোটেও না।'

'তাহলে কি তুই আমার চেয়েও বেশি চিনিস?'

'চিনি কিনা জানি না, তবে...।'

'তোর এই একটা বদভ্যাস। পরিষ্কারভাবে কোনো কথা বলিস না। একটু বলবি তো বাকিটুকু পেটের ভেতর রেখে দিবি। কথার মাঝখানেই কথা শেষ করে ফেলিস।' মলি রাগে গজগজ করতে থাকে।

'তুই আসলে খুব সেন্টিমেন্টাল।' কান্তা হাসতে হাসতে বলে। 'রাগলে তোকে খুব সুন্দর লাগে। গাল দুটো কেমন লাল হয়ে যায়।'

'ন্যাকামি রাখ তো।' চিউ করে মলি একটা শিস বাজাল। ওর শিস বাজানো শুনে বোঝার উপায় নেই এটা কোনো মেয়ে বাজিয়েছে। অবিকল ছেলেদের মতো শিস বাজাতে পারে সে। ওর শিসের শব্দ শুনে কান্তা আর প্রেমা প্রায় চমকে উঠল। ছেলে তিনটা ফিরে তাকাল। ঠিক বাংলা সিনেমার ভিলেনের মতো সঙ্গে সঙ্গে একটা আঙুল বাঁকিয়ে ছেলেদের ডাক দিল মলি। ছেলেগুলো একটু বিব্রত বোধ করে পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। মলি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই যে মিস্টারস, আপনাদেরই ডেকেছি।'

ছেলেগুলো কাছে এলো। সবার মধ্যে একটু অসহায় ভঙ্গি। যেন বড় কোনো অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।

'প্রেম করেছেন কোনোদিন?' মলি সরাসরি কথাটা ছেলেদের বললেও চোখটা বাঁকিয়ে প্রেমার দিকে তাকাল।

একটা ছেলে একটু রেগে বলল, 'এসব কী বলছেন!'

'বুঝতে পারছেন না কী বলছি? বাংলা বোঝেন না নাকি?'

'বুঝবো না কেন?'

'তবে?'

'অপরিচিত কারো সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে? কিংবা এভাবে প্রশ্ন করে?'

'কীভাবে বলে?'

'সেটা নিশ্চয় আপনাকে শিখিয়ে দিতে হবে না।'

'কথা তো ভালোই জানেন, কিন্তু দেখে তো মনে হয় হাগু আসলে প্যান্টটাও খুলতে জানেন না।'

হঠাৎ অন্য একটা ছেলে বলল, 'কী অসভ্যর মতো কথা বলছেন!'

'কে অসভ্য, আমি না আপনি ?' মলি আঙুল উঁচিয়ে বলল।

প্রেমা হঠাৎ মলির একটা হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এসব কী করছিস মলি। থাম তো!'

'তুই চুপ কর। একটু খেলতে দে। কান্তা তুইও কি প্রেমার মতো ভয় পাচ্ছিস ? দেখিস, কেঁদে ফেলিস না আবার।' ফিসফিস করে কথাগুলো বলে মলি ঘাড় ঘুরিয়ে আবার ছেলেগুলোর দিকে তাকাল। বলল, 'এই যে সভ্য বাবু, আপনার প্যান্টের চেইনটা আটকে রাখুন। জায়গাটা যে স্টেডিয়ামের মতো হাঁ করে আছে। প্যান্টের চেইন খোলা রাখাটা নিশ্চয় সভ্যতা নয় ?'

ছেলেটা ঝট করে প্যান্টের চেইনে হাত দিল। সত্যি সত্যি চেইনটা খোলা। অসম্ভব লজ্জা পেল ছেলেটা। বিব্রত ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি প্যান্টের চেইন আটকালো। প্রেমা আর কান্তা লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওদের মুখে মিটিমিটি হাসি।

মলি কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'এই যে মিস্টার, কোথায় গিয়েছিলেন ? হিসু করতে না অন্য কিছু ?'

আর সহ্য করতে না পেরে ধাক্কা দিয়ে মলিকে পাশ ফিরিয়ে প্রেমা তার মুখ চেপে ধরল। তারপর ছেলেগুলোকে বলল, 'স্যরি ভাই। ও একটু ইয়ে রকমের, কিছু মনে করবেন না, প্লিজ। আপনারা যেখানে যাচ্ছিলেন, যান।'

ছেলেগুলো চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মলি আবার শিস বাজাল। কিন্তু ছেলেগুলো ফিরে তাকাল না। মলি উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে বলল, 'ভয় পেয়েছেন মিস্টারস, স্যরি মিস্টারেস ?'

কান্তা এবার রেগে বলল, 'আহ্ মলি, মান সম্মান কিছু রাখবি না ? থাম তো।'

'তুই আসলে একটা মাগি মানুষ।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল মলি। 'কান্তা শোন, আমার না এখন খুব মুডে একটা সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে।'

'মলি, প্লিজ চুপ কর। তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।' প্রেমা ওর রুমালটা বের করে মলির কপাল মুছিয়ে দিল। 'ইস, একেবারে ঘেমে গেছিস। এখন একটু সুস্থিরভাবে দাঁড়া তো। কান্তা, তুই যেন কী বলবি বলেছিলি। তাড়াতাড়ি বল। একটু পরে ক্লাস শুরু হবে।'

কান্তা একটু ইতস্তত করতে লাগল। প্রেমা আগ্রহী ভাব নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মলি কলেজের মাঠের ভেতর কী যেন দেখছে। হঠাৎ সে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'লজ্জা লাগছে, পান্তা বুড়ি।'

ওড়নার এক কোনা আঙুল দিয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে কান্তা থমথমে চোখে মলির দিকে তাকাল। মলি এগিয়ে এসে কান্তার মুখটা উঁচু করে ধরে বলল, 'ইস, তোকে যা লাগছে না! আমার নিজেরই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে আর কোনো ছেলে হলে তো কথাই নেই।'

'মলি, প্লিজ তুই কি একটু থামবি ? কান্তার কথাটা শুনতে দে।' প্রেমা কান্তার হাতটা ওড়না থেকে টেনে নিয়ে বলল।

'কথা আর কী শুনবি। নিশ্চয় কোনো ছেলে অসভ্য রকমের কোনো কথা বলেছে কিংবা ভয় দেখিয়েছে অথবা প্রেমের পিয়ানো বাজিয়ে শুনিয়েছে। কিরে কান্তা, সত্যি না ?' মলি টিটকারির সুরে বলল।

কান্তা এবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মলির দিকে তাকাল। এই মেয়েটাকে মাঝে মাঝে ওর প্রচণ্ড রকম অসহ্য ঠেকে। আবার কখনো কখনো অসম্ভব আপন মনে হয়। এই মুহূর্তে মলিকে খুব ভালো লাগছে। ওদের এই প্রিয় তিন বান্ধবীর হাঁড়ির খবর তিনজনই জানে। কে কখন কাকে কী বলল, কে কতবার প্রেমের প্রস্তাব পেল, কে কেমন ভাবে 'আই লাভ ইউ' বলল, সবই তারা পরস্পরকে বলে। প্রেমা আর কান্তা যদিও লাজুক ভাবে বলে কিন্তু মলির বলার মধ্যে লজ্জা কিংবা সংকোচের ছিটেফোঁটাও থাকে না।

'কিরে, কথা বলছিস না কেন, পান্তা বুড়ি ?' মলি ডান হাতের আঙুলের একটা নখ কামড়াতে কামড়াতে বলল।

প্রায় ফিসফিস করে কিন্তু স্পষ্টভাবে কান্তা বলল, 'তারেক আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে।'

'ও, এই কথা। হা হা, ভেরি গুড।' মলি চিৎকার করে বলল, 'তাহলে তো বেশ। দে, চিঠিটা দে। এখনই বড় সাইজে ফটোকপি করে এনে কলেজের গেটে লাগিয়ে দিই। উপরে শিরোনাম থাকবে, 'একজন অসহায় প্রেমিকের আকুল আবেদন।'

প্রেমা মলির চুলের বেনি টেনে ধরে বলল, 'তুই কি থামবি, না মুখটা সেলাই করে দিব ?'

'প্রেমা, মাই ডারলিং' মলি আদুরে গলায় বলল, 'ওর কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ে দেখ, ওখানে মিনমিনে কথা লেখা আছে। সেগুলোও অবশ্য ভুল বানানে ভরা আর বিভিন্ন লেখকের বই থেকে ভিক্ষে করা প্রেমের তরল ডায়লগ।' তারপর মলি চোখ দুটো একটু বাঁকিয়ে কান্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে পান্তা, ঠিক বলি নি ?'

কান্তা কোনো কথা না বলে মাথাটা নিচু করে ফেলল। এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের আঙুলগুলো টানতে লাগল। প্রেমা ওর একটা হাত টেনে বলল, 'কী লিখেছে রে ?'

মলি ফোঁস করে বলল, 'ঐ যে বললাম, প্রেমের মহান ডায়লগ সংবলিত ভালোবাসার আকুল আবেদন। তাই না রে কান্তা ?'

কান্তা ডায়েরির ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে প্রেমার হাতে দিল। কিন্তু তার আগেই মলি ছো মেরে কাগজটা নিয়ে নিল। প্রেমা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আহ্ মলি, ছিঁড়ে যাবে তো। আগে পড়তে দে।'

'ওকে ডারলিং, সবাই একসঙ্গে পড়ি, কেমন।'

মলি কাগজের ভাজ খুলে প্রেমার সামনে মেলে ধরল। কান্তা মুখটা ঘুরিয়ে মাঠের দিকে তাকাল। মলি একবার কান্তার দিকে তাকিয়ে চিঠিটা নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। প্রেমাও একটু সরে এসে মলির কাছে দাঁড়াল। মলি হঠাৎ জোরে একটা কাশি দিয়ে পড়তে শুরু করল, 'প্রাণের প্রিয়তমেসু কান্তা...!'

এটুকু পড়েই কাগজটা ভাঁজ করে ফেলল মলি। মুখটা বাঁকিয়ে বলল, 'হুহ্, প্রিয়তমেসু। শালা। লিখেছে প্রাণের। আসলে শালা মনের। মনের কামনার বিছানার সঙ্গিসু। শালা, শু...বাচ্চা।'

'আহ্ মলি, তোর পায়ে ধরি, একটু চুপ কর। চিঠিটা পড়তে দে।' প্রেমা কাকুতি মিনতি করে বলল।

'চিঠি আর কী পড়বি! এরপর লিখেছে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, তুমি ছাড়া আমি শূন্য। তোমা বিনে আমার পৃথিবী অন্ধকার..., যতসব ছাগলের প্রলাপ।'

মলির হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে প্রেমা একা একা পড়তে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর কান্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু ভেবেছিস ?'

কান্তা কিছু বলার আগেই মলি রেগে গিয়ে বলল, 'ও আর কী ভাববে! সারাক্ষণ চিঠিটা পড়েছে, আর কুড়কুড়ে স্বপ্ন দেখেছে। তাই নারে পান্তা ?'

মলির কথায় প্রেমা না হেসে পারল না। হাসতে হাসতেই কান্তাকে বলল, 'তুই কী করবি।'

এবারও কান্তা জবাব দেওয়ার আগে মলি বলল, 'ও আর কী করবে, তারেককে ডেকে এনে প্রথমে পায়ের স্যান্ডেল খুলে জুতিয়ে...।'

কথা শেষ করার আগেই প্রেমা মলির তার মুখ চেপে ধরল। তারপর তার মাথায় হাত রেখে বলল, 'আমি জানি, এসব ব্যাপারে তোর এখন দারুণ ঘৃণা। কিন্তু তুই তো একদিন...।' কথা শেষ না করে প্রেমা প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, 'তোর খুব কষ্টরে মলি, এটা আমরা জানি।'

'পৃথিবীর সব মেয়েরই জানা উচিত। যতসব কুকুর ছানা। শালারা। প্রথমে মিনমিনে আলাপ। তারপর আস্তে আস্তে গা ছোঁয়া, গায়ে হাত দেয়া, তারপর একদিন সব কিছু লুটেপুটে নিয়ে পগার পার।'

'ছিঃ! সবাইকে তুই এমন ভাবছিস কেন মলি? সবাই তো আর সমান নয়।'

'আরে রাখ রাখ। সব রসুনের এক পাছা। খবরদার কান্তা, তুই তারেককে একদম পাত্তা দিবি না। ওকে দেখলেই একদলা থুথু মুখ বরাবর ছিটিয়ে দিবি। এটা আমার অর্ডার।'

'মলি, তুই বোধহয় জানিস না, তারেক খুব ভালো ছেলে।'

'উপরে উপরে সবাই ভালো, একেবারে সাধু। কিন্তু সুযোগ পেলে সবাই চাটে।'

'তা হয়তো।' প্রেমা হঠাৎ থেমে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবল। তার চোখটা কেন যেন ছলছল করে উঠল। হঠাৎ মলি প্রেমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই ছেড়ি, কাঁদছিস কেন? মেয়েদের এই একটা স্বভাব, কিছু একটা হলেই শুধু কান্না আর কান্না। যেন এছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই।'

ম্লান হেসে প্রেমা বলল, 'তুই বুঝি মেয়ে না?'

'না। আমি এখন ছেলেও না, মেয়েও না। আমি, আমি...বাদ দে ওসব। আচ্ছা কান্তা, তুই এখন কী করবি?'

গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কান্তা বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না রে। তোরা তো আছিস। যা ভালো বুঝিস...।'

কান্তার কথা কেড়ে নিয়ে মলি বলল, 'আমরা যা ভালো বুঝি তা নয়, মোট কথা এটাকে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।'

রাজনৈতিক সংলাপের মতো কান্তার কথাগুলো শুনে প্রেমা হেসে ফেলল। 'ঠিক আছে, চিঠিটা থাক। পরে আমি আর মলি বুঝেশুনে তোকে সব বলব।'

ঘাড় কাত করে কান্তা সায় জানাল। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে প্রেমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'ঐ যে, দীপ্র আসছে। ভুলে গিয়েছিলাম, তোকে তো বলা হয় নি। কিছুক্ষণ আগে দীপ্রর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিল।'

'কোনো দরকার আছে বোধহয়।' প্রেমা বলল।

চট করে মলি ফোড়ন কাটল, 'দরকার আর কী। দেখ আবার 'আই লাভ ইউ' এর সামারি বলে কিনা। যদিও দীপ্র এমন ছেলে না। কলেজের এই ছেলেটাকে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে।'

ততক্ষণে দীপ্র হাসতে হাসতে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। মলি দীপ্রর হাসিকে অনুকরণ করে বলল, 'ওয়েলকাম দীপ্র ভদ্র।'

দীপ্র একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'হোয়াট! দীপ্র ভদ্র আবার কী ?'

'বুঝলেন না ?' মলি প্রেমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনি অতিশয় ভদ্র কিনা, তাই নামের শেষে ভদ্র শব্দটা লাগিয়ে দিলাম।'

'আমি আবার আপনি হলাম কবে ? এই মলি, ইয়ার্কি রাখ তো।'

'ভদ্র ছেলেদের আমি আবার আপনি ছাড়া তুমি বলতে পারি না। শুনলাম প্রেমাকে খুঁজছিলেন। ব্যাপার কী ? কোনো...।'

প্রেমা মলিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দীপ্র কখন এসেছ ?'

'এই তো, বেশ কিছুক্ষণ হলো। তোমাকে খুঁজে না পেয়ে কান্তাকে বললাম। ও তখন কেবলমাত্র কলেজে ঢুকছে। তাই বলতে পারল না। অগত্যা ক্যান্টিনে বসে এতক্ষণ আড্ডা দিলাম।'

'আচ্ছা দীপ্র,' মলি দু'আঙুল ঠোঁটের কাছে নিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে বলল, 'তুমি সিগারেট খাও ?'

'না তো।'

'মেয়েমানুষ কোথাকার! সিগারেট না খেলে আবার পুরুষ হয় নাকি ?'

'সিগারেট খেলেই বুঝি পুরুষ হওয়া যায় ?' দীপ্র মলির দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল।

'দীপ্র, বাদ দাও তো। মলির কথা থাক। তোমার কথা বল।'

'প্রেমা তুই থাম।' মলি দীপ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। তুমি দয়া করে আমাকে একটা সিগারেট ম্যানেজ করে দাও।'

'আহ্ মলি, স্টপ। কাল তোকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দেব। আজকে ক্ষমা কর।' প্রেমা হাত জোড় করার ভঙ্গিতে বলল।

'ঠিক আছে, ক্ষমা করলাম। তা দীপ্র, তুমি প্রেমাকে কী যেন বলবে। তা আমাদের সামনে বলবে, না আমরা একটু ফাঁকে যাব ?'

'প্রেমাকে কিছু বললে বুঝি তোমরা তা জানবে না ?'

'তা জানব হয় তো।'

'সুতরাং ফাঁকে গিয়ে কী হবে ? তা কান্তা এত চুপচাপ কেন ? কিছু বলছ না যে ?'

'ও এখন নতুন জগতে পা দিচ্ছে, তাই একটু ভাবছে।' মলি হাসতে হাসতে কান্তাকে খোঁচা দিয়ে বলল।

কান্তা এতক্ষণে মুখ খুলল, 'ওর কথা শুনবে না দীপ্র। তোমরা কথা বলছ, এতেই আমার ভালো লাগছে।'

'মলি, তুই কান্তাকে নিয়ে একটু লাইব্রেরি থেকে ঘুরে আয়। দেখ তো রোকেয়া ম্যাডাম এলেন কিনা। ক্লাস আজ হবে কিনা তাও শুনে আসিস।' প্রেমা মলির ওড়নার ভাঁজ ঠিক করতে করতে বলল।

মলি প্রেমার নাকটা টেনে দিয়ে বলল, 'যাই বলিস, লুকাস না যেন কিছু। আমি সব শুনতে চাই, সব জানতে চাই।'

'এই যে দীপ্র ভদ্র, আপাতত গুড বাই।'

ওদের চলে যাওয়া দেখে মুখ ফিরিয়ে প্রেমার দিকে তাকাতেই দীপ্র দেখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে। দীপ্র নিজেও বুঝতে পারছে তার মধ্যে একটা জড়তা কাজ করছে। একটু সংকোচ আর একটু লজ্জার পরশে সে কিছু বলতে পারছে না। গলা দিয়েও কোনো কথা বের হতে চাচ্ছে না। খুকখুক করে অলৌকিক কাশি আসছে। হঠাৎ সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দীপ্র বলল, 'তুমি কেমন আছ, প্রেমা?'

কপালের চুলগুলো ঠিক করে প্রেমা হাসতে হাসতে বলল, 'ভালো। তা হঠাৎ এ কথা কেন?'

'না, এমনি। শুধু ভালো, না বেশি ভালো?'

'বেশি ভালোও না। মন্দও না। আছি এক রকম।'

'তোমাকে আজ একটা গল্প বলব।' দীপ্র মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘাসের মতো সবুজ গল্প।'

'গল্পটা বোধহয় আমি জানি।' প্রেমা সরাসরি দীপ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা মেয়ে তার কৈশোর থেকেই সেই গল্প শুনতে শুনতে বড় হয়।'

'নিশ্চয় সেই কিশোরীর গল্প শোনা আর এই সময়ের গল্প শোনার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।'

'তা রয়েছে। কিন্তু এসব গল্পের থিম ও সুর একই কিনা।'

'মোটেও না। তুমি যে সুর শুনে এসেছ হয়তো তা লোভীর। কিন্তু বাঁধনের সুর শুনেছ কিনা জানি না।'

প্রেমা বেশ কিছুক্ষণ দীপ্রর দিকে তাকিয়ে রইল। দীপ্র অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। কলেজের ঘণ্টা পড়ল। হঠাৎ একটা গভীর নিঃশ্বাসে দীপ্র ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমা চোখ নামিয়ে ফেলল।

'কিছু বলছ না যে?' দীপ্র একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

'কী বলব?'

'তোমার কথা বল।'

'আমার আবার কথা আছে নাকি ?'

'প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব গল্প আছে। কেউ বলে। কেউ বলে না। কেউ আবার সারাজীবন সেই গল্প শোনানোর জন্য কাউকে খোঁজে। কিন্তু পায় না।'

'দীপ্র, আমি তোমার গল্প শুনব।'

'তুমি তো জানোই।'

'আমার জানাটা তো ভুলও হতে পারে।'

'কখনো প্রজাপতি দেখেছ ?'

'অনেক।'

'খুব ভালোভাবে তাকিয়ে দেখেছ ?'

'বোধহয় খুব ভালোভাবে দেখা হয় নি।'

'একটি প্রজাপতির সঙ্গে একজন মানুষের যতটুকুই মিল থাক, একটা জায়গায় কিন্তু অনেক অমিল।'

'যেমন ?'

'একটি প্রজাপতি ইচ্ছা করলেই সব ফুলে বসতে পারে, মধু নিতে পারে, ফুলের পরাগ বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু একজন মানুষ তা পারে না।'

দীপ্রর কথা শুনে খিলখিল করে হেসে ফেলল প্রেমা। বলল, 'তোমার বুঝি ফুলে বসতে ইচ্ছে করে ?'

দীপ্রও হেসে বলল, 'সব ফুলে নয়। শুধু একটা ফুলে। নিতান্তই যে ফুলটা আমার হবে।'

দীপ্র একটু থেমে আবারও বলল, 'তোমার কি ভয় করছে প্রেমা ?'

প্রেমা একটু ভেবে বলল, 'ঠিক ভয় না, তবে কষ্ট হচ্ছে।'

'কেন ?' দীপ্র কিছুটা চমকে বলল।

'সামনে খাবার পেয়েও কোনো ক্ষুধার্ত যদি খেতে না পারে, সেটা কি খুব কষ্টকর নয় ?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'অত বুঝে কাজ নেই।' প্রেমা হাসতে হাসতে বলল।

'প্রেমা, তোমাকে চমৎকার একটা কবিতা শোনাব ?'

'বিরহের না মিলনের ?'

'তুমি বুঝে নিও।'

'কবিতা আমি তেমন বুঝি না।'

'বুঝতে চেষ্টা কর।'

প্রেমা দীপ্রর শার্টের একটা বোতাম ধরে বলল, 'দীপ্র, তুমি খুব সুন্দর করে কথা বল। তোমার সুন্দর করে বলা কথাগুলোই আমার কাছে কবিতা মনে হয়।'

'আমার সব কথা তুমি বুঝতে পার?'

মাথাটা কাত করে প্রেমা বলল, 'সব। স-ও-ব বুঝতে পারি আমি।'

'কিন্তু তুমি কিছু বল না কেন?'

'আমি যে অসহায়।'

'কে বলল তুমি অসহায়? তোমার সব আছে। তোমার নদী আছে। সে নদীতে জল আছে। তারার ফুল আছে। বটের ছায়া আছে। তোমার সব আছে।'

'দীপ্র, কোথায় যেন পড়েছিলাম, না জেনে আগুনে হাত দিলে সান্ত্বনা আছে। কিন্তু জেনে পুড়লে কষ্ট বেশি।'

'তোমার অনেক কথা আমি বুঝি না।'

'তুমি আসলে খুব সরল, দীপ্র। আর...' প্রেমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, 'অনেক ভালো। সবার কাছে তো বটেই, আমার কাছেও।'

'ধন্যবাদ।'

'দীপ্র জানো, মাঝে মাঝে নিজেকে আমার পৃথিবীর সেরা সুখী মনে হয়। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখীও বোধহয় আমি।'

'এটা সবারই মনে হয়।'

'সবার মনে হওয়া আর আমার মনে হওয়া বোধহয় এক না।'

'একী! তুমি কাঁদছ?'

'কান্না আসছে যে।'

'থাক। তোমাকে একটা মজার গল্প বলি। এক মেয়ে...।'

'এই গল্পটা তুমি অনেকবার বলেছ দীপ্র।'

'তোমার মজা লাগে না?'

'তোমার এই গল্পের কথা শুনলেই আমার সারা শরীর মজায় ভরে যায়।' প্রেমা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'ঐ দেখ, তোমার বোন অরকীয়া না?' প্রেমা হাত তুলে কাছের তিনটি মেয়েকে দেখাল।

'হ্যাঁ, নীল শাড়ি পরাটা।'

'আমি চিনি। ওর নাম অরকীয়া।'

'হ্যাঁ।'

ঠিক সে সময় অরকীয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে দীপ্রর দিকে তাকাল। চাহনিতে স্বচ্ছ বিষণ্নতা। কিন্তু সে চাহনির স্থায়িত্বকাল খুবই অল্প। দীপ্র ওর দিকে তাকাতেই মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গের মেয়েগুলোকে নিয়ে অন্যদিকে পা বাড়াল। দীপ্র চিৎকার করে ডাকল, 'এই অরু।' কিন্তু অরকীয়া ফিরে তাকাল না। বান্ধবীদের নিয়ে চলে গেল। দীপ্র আপন মনেই বলল, 'শুনতে পায় নি বোধহয়।'

'শুনেছে। তবে আসবে না। হয়তো লজ্জা পেয়েছে। খুব মিষ্টি মেয়ে। ওকে দেখলে মাঝে মাঝে আমার ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করে।' প্রেমা দীপ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই, কী ভাবছ?'

'কিছু না।'

'অরকীয়াকে তোমার কেমন লাগে?'

'ভালো। ও আমার বোন না!'

'হ্যাঁ, ফুপাতো বোন। বড্ড মিষ্টি মেয়ে। এই দীপ্র, চলো, ক্লাসের সময় হলো।'

'তুমি যাও। আজ ভালো লাগছে না।'

প্রেমা হাসতে হাসতে দীপ্রর ডান হাতের তালুর রেখাগুলোতে আঙুল বুলাতে বুলাতে বলল, 'তুমি খুব ভাগ্যবান দীপ্র। তোমার ভাগ্যের সঙ্গে যে ভাগ্য মিলাতে পারবে সেও খুব ভাগ্যবতী হবে।'

দীপ্র কিছু বলল না। শুধু প্রেমার দিকে একবার গভীরভাবে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। দূরে কোথায় যেন অনেকগুলো পাখি কিচিরমিচির করছে। দীপ্র ও প্রেমা সেই কিচিরমিচির শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে গেল।

প্রতিদিন সকালে এ ঘটনাটা ঘটবেই। চিরন্তন সত্যের মতো ঘটনাটা ঘটা চাই-ই। দীপ্র একটু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। পড়াশোনা কিংবা যে কারণেই হোক– শুতে শুতে তার বেশ রাত হয়ে যায়। এই বেশি ঘুমানোটাই ওর ফুপা মানতে চায় না। একজন সুখী মানুষের প্রতিকৃতিতে তিনি সব কিছুতে সুখ খুঁজতে চান। সবাইকে সুখী করতে চান। নিজেও যেমন সারাক্ষণ হাসিখুশি থাকেন, আশেপাশের সবাইকেও তেমনি সবসময় হাসিখুশি দেখতে চান। তাঁর সামনে কেউ গোমরা মুখে থেকেছে এমনটি শোনা যায় নি। সব সময় মজার মজার কথা বলবেন আর কাজে ব্যস্ত থাকবেন। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বোঝেন না।

প্রতিদিনের মতো আজকেও তিনি দীপ্রর দরজায় দুটো টোকা দিলেন। তারপর খুকখুক করে সামান্য কেশে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সারা শরীরে ঘাম। ঘরের মধ্যেও তিনি হাত পা ছোড়াছুড়ি করছেন। এইমাত্র বাইরে থেকে ব্যায়াম করে এলেন, তবুও ঘরের মধ্যে দীপ্রর সামনে যতক্ষণ থাকবেন, ব্যায়াম করতে থাকবেন। সঙ্গে সুর করে এ কথাটা বলবেন, 'বুঝলা, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। হেলথ ইজ ওয়েলথ!'

তারপর বেশ কিছুক্ষণ দীপ্রর সঙ্গে কথা বলবেন খাঁটি সাধু ভাষায়।

'বাবা দীপ্র, তুমি কি নিদ্রায় রহিয়াছ?'

দীপ্র আগে উত্তর-টুত্তর দিত। এখন শুধু উ আ, হু হা জাতীয় শব্দের মাধ্যমে আলাপ চালায়। কোনো প্রশ্নের উত্তর এখন আর সে দেয় না। ফুপাজান যতই কথা বলুক, সে খিট্টি মেরে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে যেমন ভীষণ বিরক্ত লাগে তেমনি অনেক সময় বেশ ভালোও লাগে এই সহজ সরল মানুষটিকে। আজকেও কেন যেন বেশ ভালো লাগছে। তাই সে আড়ামোড়া ভেঙে বিছানার উপর বসল।

'কি বাবা, নিদ্রা ভাঙিলো?'

'না ফুপাজান, ভাঙানো হলো।'

'তবুও বেশ। অবশেষে তো কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিল।'

'ফুপাজান কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তো জানি ফুপাজান।' দীপ্রর ইচ্ছা হলো একবার বলেই ফেলে, 'এটা তো কয়েক লক্ষবার আপনার মুখ থেকে শুনেছি।' কিন্তু বলল না। ফুপাজান আবার কী না কী ভাবেন। সরল মানুষও মাঝে মাঝে বড় জটিল হয়ে যায়। প্রকৃতির লীলা বুঝা যেমন অসাধ্য তেমনি মানুষের মনও। কখন যে কোন পরিবর্তনের জোয়ার আসে তা মাঝে মাঝে সে নিজেও জানে না।

'তবে সেটা মানো না কেন বাপধন?' দীপ্র খেয়াল করল ফুপা এখন চলিত ভাষায় কথা বলছে।

'অনেক রাত করে ঘুমাই তো, তাই সকালে ঘুম ভাঙতে চায় না।'

'এত রাত হয় কেন?'

'গভীর রাতে পড়তে আমার ভালো লাগে।'

'ও আচ্ছা। তবুও সকাল সকাল ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করা উচিত। ভালো কথা, তোমার বাবার একটা চিঠি এসেছে দোকানের ঠিকানায়। তোমার কাছে লিখেছে।' এই বলে ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা হলুদ খাম বের করে দীপ্রর হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

এমন সময় অর্ক এসে ওর বাবার পাশে বসল। বেশ কিছুক্ষণ তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। দীপ্র চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল। অর্কের বাবা হাত পা ছোড়াছুড়ি বাদ দিয়ে অর্কের দিকে তাকালেন।

'কিছু বলিবে?'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা?'

'বল।'

'তুমি এমন করে কথা বল কেন বাবা?'

'কেমন করিয়া?'

'এই যে সাধু ভাষায়।'

'আরে বোকা, সাধু ভাষা মানুষ প্রায় ভুলেই যাচ্ছে। তাই আমি একটু ধরে রাখার চেষ্টা করছি।'

'ও আচ্ছা। তা বাবা আর একটা কথা বলব?'

'একটা কেন, প্রয়োজন হইলে লক্ষটা বলিবে।'

'সবাই বলে তুমি নাকি পাগল?'

'সবাই মানে, কে বলে?'

'এই যে, এলাকার অনেকে বলে।'

'অসুবিধা কি ? পাগল বললে পাগল, তোর কি খারাপ লাগে ?'

'না। তোমাকে এই এলাকার সবাই ভালোবাসে। বলে সহজ সরল। তাছাড়া তুমি বেশ জনপ্রিয়।'

'তাই নকি ?'

অর্ক মাথা নেড়ে বলল, 'বাবা, আমিও তোমার মতো পাগল হতে চাই।'

'কেন ?' অর্কের বাবা হেসে ফেললেন।

'আমি জনপ্রিয় হতে চাই বাবা।'

'দূর পাগল।' বলেই বাবা চলে গেলেন।

দীপ্র চিঠি পড়ছে। তার কপালটা কুঁচকে যাচ্ছে। অর্ক একবার দীপ্রর দিকে তাকাল। কিছু একটা বলবে বলবে করেও বলছে না। দীপ্রর কপাল কুঁচকানো দেখে সাহস পাচ্ছে না। দীপ্র চিঠিটা শেষ করে অর্ককে বলল, 'কিছু বলবি ?'

'হ্যাঁ।'

'বল।'

'বল তো ভাইয়া, কীভাবে জনপ্রিয় হওয়া যায় ?'

'কেন ?'

'আমি জনপ্রিয় হতে চাই।'

'জনপ্রিয় হয়ে তুই কী করবি ?'

'সবাই আমাকে চিনবে, মানবে। বলবে, ঐ যে অর্ক, অর্ক রহমান যায়।'

'সত্যি তোর জনপ্রিয় হতে ইচ্ছে করে ?'

'হ্যাঁ। সিনেমার নায়কদের মতো।'

'কার মতো ?' অর্ককে মৃদু একটা ধমক দিয়ে টিটকারির সুরে দীপ্র বলল, 'ভাগ। আর লোক পেলি না ? সিনেমার নায়কদের মতো। যত্তোসব। যা এখন পড়তে বস।'

অর্ক চলে গেল। দীপ্র চিঠিটা খুলে আবার পড়তে লাগল। একবার। দুবার। বারবার। এমন সময় দরজায় শব্দ হলো। দীপ্র তাকিয়ে দেখল দোড়গোড়ায় ফুপু দাঁড়িয়ে আছে।

'ফুপু, দাঁড়িয়ে কেন। ভেতরে এসো।'

ফুপু এসে দীপ্রর পাশে বসল। বলল, 'কে লিখেছে রে ?'

'মা লিখেছে। অনেক কথা। দীপ্র চিঠিটা ওর ফুপুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি পড়।'

ফুপু চিঠিটা নিলেন। তারপর নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দীপ্রকে বললেন, 'তুই কিছু ভাবছিস ?'

'আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না ফুপু। বাবা, মা কিংবা তুমি কি এ বিষয়ে আগে কোনো কথা বলেছিলে।'

'হ্যাঁ। অরুকে তোর মায়ের খুব পছন্দ। ওই প্রথমে হাসতে হাসতে প্রস্তাবটা দেয়। তুই তো জানিস, তোর ফুপা সহজ সরল মানুষ। তিনি শুনে কিছু বলেন নি। কিন্তু আমি কথা দিয়েছি।'

'ফুপু,' দীপ্র একটু থেমে বলল, 'অরু তো এখনো তেমন বড় হয় নি। আর লেখাপড়া শেষ হতেও অনেক দেরি। তাই ভাবছি...।'

'থামলি কেন, বল ?'

'ফুপু, আমি একটু ভেবে দেখি। তাছাড়া আমি বাড়ি যাব। শিলাটা অনেক দিন ধরে চিঠি লিখে বলছে বাড়ি যাবার জন্য।'

'শিলার তো বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। ও আসলেই পারে। তোর এই বোনটাও হয়েছে তোর মতো।'

'তুমিও চল না ফুপু। অনেক দিন তো তুমি আমাদের বাড়ি যাও না।'

'আমার আর সময় কই ? দীপ্র শোন, তোর ফুপা বলেছে, আজ নাকি তার কী কাজ আছে। তাই বাজারটা কিন্তু তোকেই করতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে আমি যাই। সকালের নাস্তা এখনো শেষ হয় নি। ভাল কথা, অর্কের দিকে একটু খেয়াল রাখিস তো। কালকে ওর প্যান্ট ধুতে গিয়ে সিগারেটের গন্ধ পেলাম। তাছাড়া ওর চাল-চলনও ইদানীং আমার ভালো লাগছে না।'

'উঠতি বয়স তো। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি খেয়াল রাখব।'

ফুপু চলে যেতেই অরকীয়া নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করে প্রতিদিনের মতো দীপ্রর টেবিলটা গোছাতে লাগল। তারপর বিছানার চাদরে হাত দিতেই দীপ্র বলল, 'কিরে, মুখটা অমন মেঘ গুড়গুড় করে রেখেছিস কেন ?'

'এমনি।'

'কোনো বিরহ ভর করেছে বুঝি ?' দীপ্র মৃদু হাসল।

'ভাইয়া, তুমি সরাসরি মাকে বলে দিলেই পারতে।'

'সরাসরি কী বলব ?'

'চিঠিতে যা লেখা ছিল তোমার পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।'

'তুই জানলি কী করে ?'

'জেনেছি।'

'সারাক্ষণ কান পেতে শুধু অন্যের কথা শোনা। তাই না ?'

'তুমি কিন্তু আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'তুই কী বলিস ?'

'আমার কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে ইচ্ছেটা কী ?' দীপ্র আবার হেসে বলল।

'মেয়েদের আবার ইচ্ছের মূল্য আছে নাকি ? যেখানে গরুর মতো বেঁধে দেবে সেখানেই যেতে বাধ্য।'

'তুই তো বেশ কথা বলতে শিখেছিস।'

'ভাইয়া, সংসারে মেয়েদের স্থান খুব নিচে। এরা না পারে মুখ ফুটে নিজেদের ইচ্ছের কথা বলতে, না পারে সমস্ত বাধা ভেঙে ফেলতে। কিছুই পারে না। কষ্টের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হয় এদের। সমস্ত অসহনীয় অসহ্যতা এদেরকেই সহ্য করতে হয়।' অরকীয়ার কণ্ঠ কেমন ভেজাভেজা।

'তোর আজ কী হয়েছে রে পাগলি ?'

'কিছুই হয় নি। মানুষ তো স্বপ্ন দেখবেই। স্বপ্ন দেখা তো আর দোষের নয়। স্বপ্নটা বাস্তব হোক আর না হোক মানুষ স্বপ্ন দেখবেই। কিন্তু মেয়েমানুষ তো স্বপ্নও দেখতে পারে না।'

'মেয়ে হয়েছিস বলে তোর বোধহয় খুব কষ্ট ?'

'কষ্ট হতে যাবে কেন ? এ তো চির সত্য। বিধাতা এদের সৃষ্টিই করেছে গোলামি করতে। অন্যের মতামত মেনে নিতে।'

'ধুর। আসলে কি জানিস' দীপ্র একটু থেমে বলল, 'তুই আসলে খুব ভালোরে অরু।'

'নিশ্চয় তোমার ঐ প্রেমার মতো নয়।'

'আমার মানে ? প্রেমাকে তুই চিনিস নাকি ?'

'চিনব না কেন ? খুবই জনপ্রিয় ফিগার।'

'প্রেমা কিন্তু তোর অনেক প্রশংসা করল সেদিন। তুই নাকি দেখতে খুব মিষ্টি।'

অরু কষ্টের একটা হাসি হেসে বলল, 'তুমিও এতদিনে আমাকে দেখলে ? তাও অন্যের চোখ দিয়ে।'

দীপ্র এবার হো হো করে হেসে বলল, 'যাকে সব সময় দেখা যায়, তাকে নতুন লাগে না।'

'আসলেও তাই। আমিও কাঙালের মতো কিছু চাইতে পারি না। আমার তেমন ইচ্ছেও নেই, অধিকারও নেই। তবে রূপ দেখিয়ে মানুষকে ভুলানো যায়। ওটাও বোধহয় আমার নেই। তাই তো এত কষ্ট।'

'রূপ থাকলেই বুঝি মানুষকে ভুলানো যায় ? আরে বোকা, রূপ দেখিয়ে মানুষকে কাছে টানা যায়, ভুলানো যায়, কিন্তু বাঁধা যায় না। বাঁধতে হয় গুণ দিয়ে। রূপের টান এড়ানো যায় কিন্তু গুণের বাঁধন কেউ ছাড়াতে পারে না।'

'তবুও রূপের একটা মূল্য আছে।'

'তা আছে। তবে এর চেয়ে গুণের প্রয়োজন ঢের বেশি।'

'কী কী গুণে একজনকে বাঁধা যায়, ভুলানো যায় তা যদি জানতাম তবে এত কষ্ট থাকত না।'

'অযোগ্যতা মানুষকে প্রতারিত করে।'

'তাই হবে। আমিও বোধহয় অযোগ্য। তাই আমার স্পর্ধা দেখানো উচিত নয়। অযোগ্যের স্পর্ধায় মানুষ অবজ্ঞার হাসি হাসে।'

ঝট করে দীপ্র অরকীয়ার দিকে তাকাল। অরকীয়া মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। পিঠটা দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন স্তম্ভিত হয় গেল দীপ্র। একজন মানুষকে দেখে তেমন কিছু বোঝা যায় না। বলাও যায় না। কিন্তু সময়ে সেই মানুষ কত কথা বলে, কত কর্ম করে, কত বুদ্ধির পরিচয় দেয় তা ভেবে ভীষণ অবাক হয় দীপ্র।

'অরু শোন।'

অরকীয়া দীপ্রর দিকে তাকাল। ওর চোখ দু'টো লাল হয়ে ফোলা ফোলা হয়ে আছে। দীপ্র একটু চমকে উঠল।

ম্লান হেসে দীপ্র বলল, 'কাঁদলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়।'

'শুধু চোখই ? যার সব নষ্ট হয়ে যায় ?'

'তার মরে যাওয়া উচিত।'

বিস্মিত চোখে অরকীয়া দীপ্রর দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে বুকের মধ্যে কী যেন বয়ে যাচ্ছে। একটা গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল।

অরকীয়া চলে যেতেই নিজেকে অসম্ভব অপরাধী মনে হলো দীপ্রর। জানালা দিয়ে চকচকে সোনালি রোদ এসেছে। সে অনেকক্ষণ রোদের দিকে তাকিয়ে রইল। অসম্ভব নির্জন মনে হচ্ছে এখন সব কিছু। প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি। শূন্য মনে হচ্ছে চারদিক। নিজের অস্তিত্ব যেন হারিয়ে যাচ্ছে কোথাও। খুব নিঃশব্দে গোপন একটা ব্যথা বয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতর দিয়ে। প্রচণ্ড বেগে কিন্তু আড়ালে আড়ালে। দীপ্র সে ব্যথা অনুভব করতে পারছে। কিন্তু ধরতে পারছে না। কিছুতেই না।

রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। সকালের ঘাসগুলোকে তাই গাঢ় সবুজ মনে হচ্ছে। বেশ চিকচিকও করছে। রোদ পড়ায় ঘাসের ডগার পানিগুলো অসম্ভব রকম সুন্দর লাগছে। মলি অনেকক্ষণ ধরে ঘাসগুলো দেখছে আর মাঝে মাঝে আলতো করে ঘাসগুলো স্পর্শ করছে। ঘাসের ডগায় জমে থাকা বিন্দু বিন্দু পানিতে হাত ভিজে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মলি।

ইদানীং রাতে মলির তেমন ভালো ঘুম হয় না। অনেক কারণ তো আছেই, তাছাড়া বেশ ভ্যাপসা গরম পড়ছে। কিন্তু গতরাতে বৃষ্টি হওয়ার কারণে ওম ওম একটা ঠাণ্ডা আমেজ ছিল বলে ভালো ঘুম হয়েছে তার। চোখমুখে একটা ফোলা ফোলা ভাব এসেছে। অনেকদিন পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখেছে সে।

মলি দেখতে অনেক সুন্দর ছিল। তারপরও সুন্দর থেকে সুন্দরতর হওয়ার জন্য তার চেষ্টার কমতি ছিল না। সবাই তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে, প্রশংসা করবে—এই আশাটা মনের ভেতর নাড়াচাড়া করেছিল সর্বক্ষণ। সবচেয়ে বড় কথা, মিলনের মুখ থেকে 'তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে'। এই জাতীয় কথা শোনার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে থাকত সবসময়।

প্রতিদিন কলেজে আসার পর মিলনের সঙ্গে দেখা হলেই অপেক্ষায় থাকত, কখন মিলন কথাটা বলবে। দু'হাত চেপে ধরে আদর করে মিষ্টি সুরে বলবে, 'মলি, তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। খুউব।'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মলি কলেজের গেটের দিকে তাকাল। বেশ কয়েকদিন হলো প্রেমা কলেজে আসছে না। প্রায়ই সে মাঝে মাঝে দু'চার দিন কলেজে আসে না। কেন আসে না তাও পরিষ্কারভাবে বলে না। কখনো বলে চাকরির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কখনো বলে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার কথা শুনেই বোঝা যায় এগুলো স্রেফ খোড়া অজুহাত।

প্রেমা একটা ফার্মে চাকরি করে। একথা মলি ও কান্তা দুজনেই জানে। সপ্তাহে চারদিন প্রেমাকে অফিস করতে হয়। কিন্তু মলি লক্ষ করেছে, সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোনো চারদিন প্রেমা অফিসে যায় না কিংবা কলেজে অনুপস্থিত থাকে না। মাঝে মাঝে সে

কলেজ অনুপস্থিত থাকে, তবে নির্দিষ্ট কোনো দিনে নয়। সেটা অফিসের জন্য কিনা, তা অবশ্য মলি জানে না। সে আরো খেয়াল করেছে, বেশ কয়েক সপ্তাহ প্রেমা পুরো ছয়দিনই কলেজে এসেছে। এ নিয়ে প্রেমাকে কোনো প্রশ্নও করে নি মলি। তার তেমন কৌতূহলও জাগে নি। প্রেমা এসেছে। হাসি আনন্দের মুহূর্তগুলো হচ্ছে। ব্যস্, এতেই সে খুশি।

মলি বেশ কয়েকবার ভেবেছে, প্রেমা যেহেতু কয়েকদিন হলো কলেজে আসছে না, তাই তাদের বাসায় যাবে। কিন্তু কেন যেন যাওয়া হচ্ছে না। সেই সেদিন দীপ্রর সঙ্গে কথা বলার পর প্রেমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। দীপ্রও কয়েকদিন হলো কলেজে আসছে না। মলি অনেক ভেবেচিন্তেও এর কোনো যোগসূত্র খুঁজে পেল না। শেষে সেই সন্দেহটাই মনে জাগল। দীপ্র আর প্রেমা আবার কোথাও ভেগেটেগে গেল না তো! কথাটা যতবার ভেবেছে ততবার মনে মনে হেসেছে। যদিও প্রেমা আর দীপ্রর মাঝে সেদিন কী কথা হয়েছিল তা এখনো সে জানে না।

কান্তা সেদিন নাকি প্রেমাদের বাসায় গিয়েছিল। কিন্তু মলি এ বিষয়ে প্রেমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে নি। ও গিয়েছিল শুধুমাত্র নিজের সমস্যার ব্যাপারে আলাপ করতে। প্রেমা নাকি বলেছে, খুব সাবধানে এগোতে। তাই এ কদিনে কান্তা তারেকের সঙ্গে বেশ খোলামেলা হয়েছে। প্রায়ই তাদের দেখা যায় এক সঙ্গে কোনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছে কিংবা মাঠের এক কোণে ঘাসের উপর বসে বাদাম চিবোচ্ছে। দূর থেকে ওদের দেখে মলির ঈর্ষা না হলেও বুকের ভেতর ব্যাখ্যাহীন এক ধরনের কষ্ট অনুভব করছে। চাপ চাপ কষ্ট। যদিও কান্তা তার প্রিয় বান্ধবী তবুও অবাধ্য কষ্টটা তার বুকে ভর করে। এই কষ্টটা বান্ধবীর সুখের জন্যে না নিজের দুঃখের জন্যে, তা মলি কোনোভাবেই বুঝতে পারে না।

মনে পড়ে, কতদিন সে এভাবে মিলনের সাথে মিশেছে। দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছে। সুখ, দুঃখ এবং ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা। মাঠের সবুজ ঘাসের গালিচায় বসে বিরতিহীনভাবে বাদাম খেয়েছে। কোনো একটা বিষয় নিয়ে হঠাৎ-ই হাসতে হাসতে কতবার যে একে অন্যের গায়ে লুটিয়ে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এ সুখ মলির বেশিদিন সয় নি। সম্পর্ক গাঢ় হতে হতে একদিন হঠাৎ করেই, কোনোরকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই কালবোশেখী ঝড়ের মতো মিলন তার সব কিছু ছিনিয়ে নেয়। জমিয়ে রাখা স্পর্শহীন মুক্তা, প্রজাপতি না বসা ফুল, সব। তারপর থেকেই মিলনের মধ্যে শুরু হয়েছিল ভাঙনের সুর। কোনো এক অজানা কারণে মিলন তাকে এড়িয়ে চলেছে। দূরে দূরে থেকেছে। একদিন এ নিয়ে পরিষ্কার কথা উঠতেই মিলন তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তার পক্ষে আর মলির সাথে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। কারণটা স্পষ্ট না জানালেও 'সম্ভব না' শব্দ দুটো বেশ স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবেই

মিলনের মুখ থেকে শুনেছিল মলি। আর ঠিক সেদিন, আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে সেই মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীর সবকিছু ফাঁকা মনে হয়েছিল মলির। চোখের সামনে অস্পষ্ট মাকড়সার জাল, মাথার ভেতর চিন্তাহীন অনুভূতি, বুকের ভেতর স্বপ্নচূর্ণ হওয়ার যাতনা আর মনের ভেতর শব্দহীন অস্পষ্ট স্মৃতির দাপট। স্রেফ একটা ব্যাপারই মলি স্পষ্ট বুঝেছিল— মিলন তাকে ঠকিয়েছে।

মলি বুঝতে পারে ভালোবাসার ব্যাপারে এখন তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা উৎসাহ অবশিষ্ট নেই। কেউ কাউকে ভালোবাসছে, প্রেম করছে কিংবা নতুন প্রেমে পড়ছে এ কথা শুনলেই তার মাথায় কেন যেন আগুন জ্বলে উঠে। যদিও এর কোনো উপযুক্ত কারণ নেই। সবাই তো মিলনের মতো নয়। পৃথিবীতে অনেকে প্রেম করে বিয়ে করেছে। বেশ সুখেও আছে তারা। কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে ইদানীং সে প্রেমের ব্যাপারে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এই রহস্যময়তা যে বিশ্বাসভঙ্গের উল্টোপিঠ তা বুঝেও বুঝতে চায় না মলি। তাই কান্তার ব্যাপারটা প্রথমে সে সহ্যই করতে পারে নি। কারণ কান্তার জীবনেও যদি তার মতো কিছু ঘটে ? কিন্তু তারেককে কাছ থেকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে মলি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। সে বুঝতে পারছে, সবাই মিলনের মতো প্রতারক নয়।

মাঝে মাঝে মলি ভাবে, প্রেমা কেমন করে এখনো প্রেম না করে চলতে পারছে! ওর মতো সুন্দরী মেয়ের অনেক আগেই অনেক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কিছুই হয় নি। যদিও যতই আপন হোক, একান্ত ব্যক্তিগত এমন অনেক কথা আছে যা কেউ কখনো কাউকে বলে না। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা তো একান্ত ব্যক্তিগত কিছু নয়। অন্তত প্রিয় বান্ধবীদের কাছে। প্রেমা কি তবে এ বিষয়ে কোনো কিছু লুকোচ্ছে ? মলি ভাবে, এটা কী করে সম্ভব ? সে নিজেই তো দেখেছে, কত ছেলে ওকে প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু প্রেমা তাদের পাত্তাই দেয় নি। এসব ব্যাপারে ওর যেন কত অনীহা, কত ঘৃণা।

সেদিন দীপ্রর সঙ্গে কথা বলার পর মলির মনে এক নতুন স্বপ্ন জেগেছে। হয়তো এতদিনে প্রেমা তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে। যদিও দীপ্র খুবই ভালো ছেলে। সহজ সরল হলেও প্রখর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে স্মার্টনেসের একটা অদ্ভুত ছোঁয়া আছে। ভালো ছাত্র তো বটেই। কিন্তু মলি এখনো জানল না প্রেমা আর দীপ্রর মাঝে সেদিন কী কথা হয়েছে। প্রেমাটাও যে কী! সেই যে গায়েব হলো, আর কোনো খবর নেই। মলি ভাবে, একবার হাতের নাগালে পেলে হয়, মজা কাকে বলে দেখাব।

মলি আজ কলেজে একটু সকালে এসেছে। আশা করেছিল আজ অন্তত কান্তাকে কলেজে পাবে। কয়েকদিন হলো কান্তা একটু তাড়াতাড়িই কলেজে আসে। কে জানে, হয়তো তারেকও আসে বলে। ক্লাস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত দুজন

একসঙ্গে বসে কথা বলে। মাঝে মাঝে মলি এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আবার কখনো তারেকের সঙ্গে কথা শেষ করে কান্তা মলির কাছে চলে আসে। তারেক কী বলল, কীভাবে বলল, মলি তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কান্তার কাছ থেকে জেনে নেয়। মাঝে মাঝে তাকে আবার সাবধান করে দেয়। এভাবে চলতে হবে, এটা করতে হবে, এভাবে এগোতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব শুনে কান্তা হেসে গড়িয়ে পড়ে। মলি তখন কপট রাগে বলে, 'হাসছিস! নিজেকে ফোটা ফুলের মতো মেলে দিলে একদিন যখন আমার মতো পস্তাবি, তখন বুঝবি।' মলির এ মন্তব্য শুনে কান্তার হাসির জোর আরো বেড়ে যায়। মলি অদ্ভুত চোখে কান্তার সারল্য দেখে। দেখে আর ভাবে। ভাবে আর শঙ্কিত হয় এই ভেবে যে, কান্তার জীবনটাও যদি তার মতো অবেলায় এলোমেলো হয়ে যায়!

কান্তাও আজ কলেজে আসে নি। বিষণ্ন মণ নিয়ে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা শেষে লাইব্রেরির উদ্দেশে পা বাড়াতেই গেটের দিকে তাকিয়ে তার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রেমা আসছে।

ভীষণ অভিমানী হয়ে উঠল মলির মনটা। ভাবল, আগ বাড়িয়ে প্রেমার সঙ্গে আজ সে কোনো কথা বলবে না। প্রেমা কাছে এসে বসলেও কিছু বলবে না। কিন্তু প্রেমা যখন ওকে দেখামাত্রই হাত তুলে মধুর একটা হাসি ছুড়ে দিল, তখন মলির সব কিছু উল্টে গেল। আনন্দে তার মনটা প্রজাপতির মতো লাফিয়ে উঠল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রেমা কাছে আসতেই তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর অভিমানী কণ্ঠে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম তুই মরে গেছিস।'

'তোর ভাবনাটা সত্যি হলেই ভালো হতো।' বলতে বলতে প্রেমা তার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করল।

'এই, তোর কী হয়েছে রে? মুখটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে।' মলি প্রেমার দু'হাত জড়িয়ে ধরল।

প্রেমা নিশ্চুপ। রুমাল দিয়ে ঠোঁটের এক কোণা মুছতে মুছতে মলির চোখের দিকে তাকাল। দু সেকেন্ড কী যেন ভেবে বলল, 'কান্তা আসে নি?'

'না। ও তো বেশ আনন্দে আছে। তারেকের সঙ্গে হাওয়ায় উড়ছে। ভালো কথা, তোর খবর কী?'

'আমার আর কী খবর?' প্রেমার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন অলৌকিক স্থিরতা।

'সেদিন কী কথা হলো?' মলির চোখেমুখে একই সঙ্গে আনন্দ ও আগ্রহ ফুটে উঠল।

প্রেমাও মুচকি হেসে বলল, 'ওকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতিস।'

'দীপ্র তো বেশ কয়েকদিন হলো কলেজে আসে না। তুই হঠাৎ উধাও হলি। সে-ও। এই প্রেমা জানিস,' মলি প্রেমার চিবুকে হাত দিয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুই আর দীপ্র পালিয়ে গেছিস।'

'ধুর পাগল। এটা সম্ভব নাকি?'

'তাহলে এতদিন কোথায় ছিলি?'

'বাসায়ই ছিলাম। মন খারাপ ছিল বলে কলেজে আসি নি।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রেমার কাঁধে চিবুক রেখে মলি বলল, 'বল না, দীপ্রর সঙ্গে সেদিন কী কথা হলো?'

'কান্তা আসুক, তারপর বলি। চল, দোতালায় যাই।' কাঁধ থেকে মলির চিবুকটা নামিয়ে দিতে দিতে প্রেমা বলল।

'ধুর। কান্তার এসব শোনার সময় আছে নাকি? ও তো এখন দিবস রজনী মিলনকে নিয়েই ব্যস্ত। ওর নিজের কথাই শোনার লোকই নেই আবার তোর কথা শুনবে সে! '

'তবুও।' প্রেমা আর মলি হাঁটতে হাঁটতে দোতলায় এলো। 'দীপ্র এতদিন কলেজে এলো না কেন বুঝতে পারছি না। কোনো অসুখ বিসুখ বা সমস্যা হলো না তো আবার!' প্রেমার কণ্ঠে উৎকণ্ঠার সুর স্পষ্ট।

'বাব্বাহ। একদিনেই এত দরদ? কই, আমাকে তো বললি না কেমন আছিস বা কেমন ছিলি!' মলির কণ্ঠে অভিমান।

'ভালো আছিরে। সত্যি ভালো আছি। যদিও সেটা বোতলে রাখা পাতাবাহারের ডালের মতো। তবুও। আসলে আমরা সবাই ভালো আছি একটা অনিশ্চয়তা নিয়ে। দুঃখ আর কষ্ট নিয়ে। তাছাড়া আর উপায় কী, বল? এভাবেই তো বেঁচে থাকতে হবে। ভালো থাকতে হবে।'

'বাদ দে ওসব। তোর কথা বল।'

'কান্তা আসুক। একসঙ্গে বলব। এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না।' মলির জামাটায় হাত দিয়ে প্রেমা বলল, 'এই জামাটায় তোকে খুব সুন্দর লাগে।'

'শিশুদের চাঁদ দেখার মতো, তাই না? চাঁদকে ওরা 'আয় আয়' বলে ডাকবে কিন্তু কোনোদিন কাছে পাবে না। চাঁদেরও কোনোদিন পৃথিবীতে নেমে আসার ইচ্ছা বা ক্ষমতা হবে না। চাঁদের জায়গায় চাঁদ রয়ে যাবে, শিশুর স্থানে শিশু। একজনের অতৃপ্তি অন্যজনের অক্ষমতা।'

প্রেমা মলির কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'মলি, তুই সব ভুলে যা। নতুন করে আবার সবকিছু শুরু করা যায় না?'

'নতুন কিছু গড়তে হলে সাহসের প্রয়োজন। ইচ্ছার প্রয়োজন। আমার সে সাহস কিংবা ইচ্ছা কোনোটাই নেই।' বলতে বলতে মলি মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

'তবুও চেষ্টা করতে দোষ কী? ভুল আছে বলেই তো মানুষ শোধরাতে শিখেছে।'

এ কথা শুনে মলি বেশ কিছুক্ষণ প্রেমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, 'ভুল করলে না হয় অনুতাপ করতাম। কিন্তু আমি তো কোনো ভুল করি নি। নিজের বিশ্বাস আর ভালোবাসাকে সাজিয়ে ছিলাম মাত্র। বল, বিশ্বাস আর ভালোবাসা সাজানো কি ভুল?' মলির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

দুজনের কেউই কথা বলছে না। চাপা কান্নায় মলির শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। প্রেমা বোবাদৃষ্টিতে মলিকে দেখছে। এই মুহূর্তে সে কী করবে বা তার কী করা উচিত কিছুই মাথায় আসছে না। ন্যূনতম সান্ত্বনাটুকুও যে দিতে হবে তাও ভুলে গেছে। কিছুক্ষণ পর পরম আন্তরিকতার পরশে সে মলির মাথায় হাত রাখল। প্রেমার দু'চোখের পাতা শিরশির করছে। তারও কান্না আসছে।

কলেজ গেটের দিকে চোখ পড়তেই প্রেমা দেখতে পেল, কান্তা আর তারেক একসঙ্গে হেঁটে আসছে। কান্তার মুখটা হাসি হাসি। ভীষণ উজ্জ্বল। ওরা অদ্ভুতভাবে গা ঘেঁসে ঘেঁসে হাঁটছে। কলেজের ভেতর এমনভাবে গা ঘেঁসে কীভাবে হাঁটা যায় প্রেমা তা বুঝতে পারে না। তবে প্রেম কি মানুষকে সত্যি সত্যি সাহসী করে? হয়তো তাই। আর এই সাহসিকতায় কেউ নির্মাণ করে ভালোবাসার মহল আর কেউ সর্বনাশের সিঁড়ি।

চোখ মুছতে মুছতে প্রেমা বলল, 'দেখ দেখ, কান্তা আর তারেক আসছে। পাজি কান্তাটা কীভাবে হাসছে দেখছিস!'

মলি ওড়না দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কলেজের মাঠের দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। কান্তার দিকে তাকাতেই মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল। কপালের চুলগুলো আলতোভাবে গুছিয়ে বলল, 'কান্তাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। শুনেছি প্রেমে পড়লে মানুষ নাকি সুন্দর হয়।'

এমন সময় কান্তা ওদের দিকে তাকাল। বিনিময়ে মলি হাত তুলে তাদেরকে কাছে ডাকল। কান্তা চোখ সরিয়ে তারেকের দিকে তাকাল। তারেক কী একটা বলে লাইব্রেরির দিকে চলে গেল।

কান্তা হাসতে হাসতে ওদের কাছে এসেই প্রেমার দু'কাঁধ চেপে ধরে বলল, 'এই এতদিন কোথায় ছিলি?'

কৌতুকের সুরে প্রেমাও বলল, 'এই এতদিন কেমন ছিলি?'

কান্তা একটু লজ্জা পেয়ে মলির দিকে চোখ ফেরাতেই চমকে উঠল। বলল, 'তোর চোখ লাল কেন, কেঁদেছিস নাকি ?'

মলি কোনো কথা বলল না। প্রেমা মলির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কেন ?' আশ্চর্য হয়ে কান্তা বলল।

'কেন আবার ? সুখী হওয়ার, হাসিখুশি থাকার যেমন অনেক কারণ আছে তেমনি কাঁদারও অনেক কারণ থাকে।'

'তা আমি জানি প্রেমা। কিন্তু মলি কেঁদেছে কেন ?' কান্তার চোখ টলটল করছে।

'এই ছুড়ি, তুইও কাঁদবি নাকি ?'

ওড়না দিয়ে নাক মুছতে মুছতে প্রেমার দিকে তাকিয়ে কান্তা বলল, 'কারো কান্না দেখলে আমার সহ্য হয় না। তাও আমার মলি। আচ্ছা, তুই ওর কান্না থামাতে পারিস নি।'

'দুঃখের কান্না থামাতে হয় নারে পাগলি। কান্নার জলের সঙ্গে দুঃখগুলোও গড়িয়ে গড়িয়ে বের হয়ে যায় বলেই তো মানুষ কাঁদে। চোখের জল ফেলে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে অসীম দুঃখের মাঝেও মানুষ বেঁচে থাকে।' বলতে বলতে প্রেমা উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এসব প্যানপ্যানানী মার্কা দুঃখ আর কান্নার কথা রাখ তো।' মলি হাত দিয়ে প্রেমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এবার তোমার সুখ কাব্য শুরু করো। শুনে প্রাণ জুড়াই।'

'প্রাণ জুড়ানোর মতো কোনো কথা নেই। তবে...' প্রেমা কান্তার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। বলল, 'তুই কেমন আছিসরে পাগলি। কেমন লাগছে ভালোবাসার তরী বইতে ?'

'ভালো।' লজ্জিত কণ্ঠে কান্তা বলল।

মলি হঠাৎ কান্তার বাঁ কাঁধ দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, 'বল না সখি, কেমন লাগে ভালোবাসার ছোঁয়া।'

মলির কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রেমা বলল, 'শুনে মোদের প্রাণের মাঝে সুখের হাওয়া বহুক।'

কান্তা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'এই, তোরা ঠাট্টা করছিস না তো।'

কান্তার রাগ দেখে হাসতে হাসতে প্রেমা বলল, 'তা তোর ঐ প্রাণ পুরুষটি কেমন ?'

'ও খুব ভালোরে। আমাকে খুব বিশ্বাস করে। আমিও করি।'

'তবে অতি বিশ্বাসে আবার গলে যেও না। তাতে দুঃখ আছে।' মলি কান্তার একটা আঙুল টেনে বলল।

'আসলে মলি, কারো মধ্যে সকল বিশ্বাস স্থাপন করে আসল বলে যা ভাবা যায়, নকল বলে তা কখনো ভাবা যায় না। ভাবতে আমি চাইও না। কখনো ভাববোও না।'

'ভালো। তবে খেয়াল রাখা উচিত, সেই আসলটা যেন সবসময় আসলই থাকে। নতুন কোনো পদার্থের মিশ্রণে অন্যরূপ না নিলেই হলো। সুতরাং একটু সাবধান হয়ে চলতে হবে সখী।'

'আমি চেষ্টা করব। আর তোরা তো আছিস। তোর অভিজ্ঞতা আর প্রেমার দৃঢ়তা আমাকে ভুল করতে দিবে না। এ বিশ্বাস আমার আছে।'

'তা তারেক মশাই কি লাইব্রেরিতে গেল ?' মলি হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল।

'হ্যাঁ।'

'আসবে না এখানে ?'

'হ্যাঁ, একটু পরেই আসবে।'

মলি কান্তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সত্যি করে বল তো, কেমন লাগছে এসব ?'

'তুই তো জানিস।'

'তা জানি। তবুও একেকজনের অনুভূতি এবং অনুভব একেক রকম। সেটাই শুনতে ইচ্ছে করে।'

'এ এক অভূতপূর্ব সুখ। শরীরের সমস্ত রন্দ্রে রন্দ্রে সুখ জাগায়। শান্তির এক ঝিরিঝিরি বাতাস বুকের মাঝ দিয়ে বইতে থাকে। ভীষণ সুশীতল সে বাতাস। পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে মনে হয় রঙিন। সবাইকে মনে হয় সুখী। আর নিজেকে মনে হয় সুখের রানী।'

'চমৎকার।' মলি চোখ দুটো একটু উল্টিয়ে বলল, 'তা উনি কেমন ?'

'বললাম তো ভালো।'

প্রেমা এবার আদুরে ভঙ্গিতে বলল, 'শুধু ভালো, না বেশি ভালো ?'

মলি লাফিয়ে উঠে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'বলনা সখি, যার ফিসফিস কথায়, যার বাহুবন্ধনে কালো ঝর্ণার মতো বইতে থাকে আমার রক্তের স্রোত; স্পর্শে বিলীন হয়ে যায় সারাজীবনের আশাহীনতা, কলঙ্ক, কদর্যতা আর উন্মাদনা, জেগে ওঠে সুখময় স্মৃতি, সঙ্গীত এবং প্রত্যাশা। একটি সুখের ভুবন।'

'ধুর। ও আমাকে আজ পর্যন্ত স্পর্শই করে নি। বাহুবন্ধন তো দূরের কথা।'

'সখি লো সখি, এটা একটা উপন্যাসের নায়কের কথা। আজ তোমার কথা বলে চালিয়ে দিলাম। তা তোমাকে বুঝি কোনোদিন চুমোও খেতে চায় নি ?'

'মলি প্লিজ, চুপ কর তো।' কান্তা প্রেমার দিকে তাকিয়ে দেখে প্রেমা হাসছে। 'অত হাসতে হবে না, এবার আপনার কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, আপনার প্রণয়কাব্য শোনার জন্য আকুল হয়ে ব্যাকুলভাবে বসে আছি।' মলি প্রায় নাচতে নাচতে বলল।

'ধ্যত! প্রণয় ট্রনয়ের কথা না, এমনি দু'চারটি কথা হলো।' প্রেমা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল।

'সেই দু'চারটি কথাই শুনতে চাই।' কান্তারও এ ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই।

'সেটা হলো সাগরের ঢেউ, ভয়ঙ্কর হলেও থেমে যায়। সেটা হলো গোলাপের গন্ধ, সময়ে গন্ধহীন হয়। সেটা ধোঁয়া ধোঁয়া, নতুন অন্ধকারের সৃষ্টি। সেটা আকাশের জ্বলজ্বলে ছোট্ট তারা, যা কপালে পরার নয়।'

প্রেমা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে মলি বলতে শুরু করলো, 'সেটা অনুভবের, স্পর্শের নয়। সেটা অস্তিত্বের, শরীরের নয়। সেটা চিরকাঙ্ক্ষিত, অনাগ্রহীত নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রেমা আর মলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে কান্তা বলল, 'সেটা সুখ। সেটা আনন্দ। সেটা বেঁচে থাকার অক্সিজেন।'

'ব্যস্ ব্যস্, অনেক হয়েছে। এবার থাম।' প্রেমা কান্তার মুখ চেপে ধরল।

'ওকে, এবার তোর কথা বল।' কান্তা মুখ থেকে প্রেমার হাতটা সরিয়ে দিল।

'কী বলব তোদের?'

'যে কথা দীপ্র বলেছে।'

'ও আসলে তেমন কিছু বলে নি। একটা গল্প শোনাতে চেয়েছিল।'

'গল্প! কিসের গল্প?' কান্তা উত্তেজিত হয়ে বলল।

মলি চিৎকার করে বলল, 'নিশ্চয় রূপকথার নয়, প্রাণের গল্প।'

'কিছুটা সেরকমই। আচ্ছা, এভাবে বলে দীপ্রকে ছোট করা হচ্ছে না তো?'

'ছোট করা হচ্ছে মানে! এখানে অন্য কেউ আছে নাকি? আমরাই তো।' মলি চোখ বড় বড় করে বলল, 'এই প্রেমা, তুই একই সঙ্গে মজেছিস এবং মরেছিস।'

'মরেছি তো অনেক আগে।' অস্পষ্টকণ্ঠে কথাটা বলল প্রেমা।

'কী বললি?' মলি বলল।

'কিছু না। শোন, কাউকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই। আর দীপ্রকে তো নয়ই।'

'এ কথা বলছিস কেন?'

'ওর গল্পটা বড্ড চমৎকার। বড় আকাঙ্ক্ষার। লোভনীয়। সেটা ধরার আগেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। নিজেকে হারিয়ে বুঝি কিছু পাওয়া যায়? মোটেও

না।' প্রেমার চোখ ছলছল করছে। 'জানিস, দীপ্র আমাকে কত সুন্দর কথা শোনাল, আমি বুঝলাম। কিন্তু ওকে বুঝতে দিলাম না। দীপ্র বড় ভালোরে। ও বলে কী জানিস ? ওর শুধু একটি ফুলের দরকার। নিতান্তই একটি। শুধু তারই মধু নাকি ওর প্রয়োজন। ও...'

'থামলি কেন, বল ?' কান্তা বলল।

'ওর বাড়িয়ে দেয়া হাত আমি স্পর্শ করেছি। কিন্তু সেটা ধরতে পারব কিনা জানি না। ঐ দেখ তারেক আসছে।'

লজ্জামিশ্রিত হাসি দিতে দিতে তাদের কাছে এসে তারেক বলল, 'কেমন আছ তোমরা ?'

'ভালো। তবে তোমাদের মতো নয়।' মলি কান্তা আর তারেকের দিকে আঙুল ঘুরিয়ে বলল।

তারেক একটু আশ্চর্যের ভান করে বলল, 'আমাদের মতো মানে ?'

মলি সঙ্গে সঙ্গে তারেকের নাকে খোঁচা দিয়ে বলল, 'খাবার খেতে জানো না, চিবিয়ে দিতে হবে নাকি ?'

হঠাৎ মলির চোখের দিকে তাকিয়েই তারেক চমকে উঠল। বলল, 'তোমার চোখ এত লাল কেন মলি ? কোনো পোকা টোকা পড়েছে নাকি ?'

'না তো।' মলির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

(সঙ্গে সঙ্গে প্রেমা মনে মনে বলল, 'পোকা চোখে পড়ে নি তারেক। পড়েছে বিবেকে। সে অদৃশ্য পোকাটা সারাক্ষণ কামড়াচ্ছে আর যন্ত্রণা দিচ্ছে।')

'কান্তা।' তারেক জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে কান্তার দিকে তাকাল।

কান্তা একটু ইতস্তত করে প্রেমা আর মলিকে উদ্দেশ করে বলল, 'তারেকের একটু জরুরি কাজ আছেরে।'

'বেশ তো, যা।' প্রেমা বলল।

'রাগ করলি নাতো ?'

'রাগ নয়, আশীর্বাদ রইল।' মলি ওর ডান হাতটা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উঠিয়ে বলল, 'সুখী হও তোমরা।'

(কান্তা আর তারেক চলে যেতেই মলি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। প্রেমা বেশ আনন্দ নিয়ে কান্তা আর তারেকের চলে যাওয়া দেখছে। ওর মনে হচ্ছে, রঙিন দুটো প্রজাপতি উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে স্বপ্নের দেশে। যে দেশে ভালোবাসার মাঝে কোনো প্রতারণা নেই। বিশুদ্ধ প্রেম আর ভালোবাসাবাসির বন্যায় যে দেশ ভেসে যাচ্ছে সবসময়; প্রতিক্ষণ।)

আজ বেশ ভোরে ঘুম ভেঙেছে দীপ্রর। মাঝে মাঝে ওর এমনিই ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যায়। তবে বিছানা ছাড়ে না। কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করে, কিছুক্ষণ আধো ঘুমে কাটিয়ে সকাল আটটা বাজিয়ে তবেই বিছানার সঙ্গ ত্যাগ করে সে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্যরকম। কাল রাতে ফুপু অরকীয়ার ব্যাপারে কী জানি বলবে বলেছিল। কথাটা না শুনলেও দীপ্র বুঝতে পেরেছে ফুপু কী বলতে চাচ্ছে। তাই তেমন ঘুম হয় নি। অনেক রাত পর্যন্ত চিন্তা করেছে, ফুপুকে সে কী জবাব দেবে।

কদিন হলো কলেজেও যেতে পারছে না। ফুপুর বুকের ব্যথা উঠেছে। তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। আজকাল সরকারি হাসপাতালে বলতে গেলে তেমন কোনো কাজই হয় না। ডাক্তার, নার্স সবাই মিলে অধিকাংশ সময় আড্ডা দেয় আর কোনো রোগী এলেই চেহারায় বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে।

হাসপাতালে এ কদিনে তেমন কোনো কাজ না হলেও একটা কাজ হয়েছে। অনেক ঘোরাফেরার পর একটি চেম্বারের খবর জানতে পেরেছে। আজ আবার সাড়ে এগারোটায় ফুপুকে নিয়ে সেই চেম্বারে যেতে হবে। যদিও ঐ চেম্বারে যে ডাক্তার বসেন তিনি এই হাসপাতালেরই। একজন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার কী করে বেলা এগারোটার সময় প্রাইভেট চেম্বারে বসেন দীপ্র তা ভেবে পায় না। তারপরও ডাক্তারের সিরিয়াল পাওয়া যায় না। সিরিয়াল পেতে হলে কমপক্ষে দেড়মাস আগে আসতে হবে। অগত্যা ডাক্তারের পিয়নকে চা নাস্তার জন্য পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আজকে সিরিয়াল নিয়েছে। ডাক্তারের ভিজিটও মাশাল্লাহ একটি মধ্যবিত্ত সংসারের প্রায় তিনদিনের খরচ!

সুতরাং আজকেও তার কলেজে যাওয়া হবে না। এই ক'দিন কলেজে যেতে না পারায় প্রেমার সঙ্গেও দেখা হচ্ছে না। মনের ভেতর ফাঁকা ফাঁকা একটি কষ্টের রেশ ভেসে থাকছে সারাক্ষণ। কাল আবার কলেজ বন্ধ। ভাবতেই দীপ্র একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। তার মানে প্রেমার সঙ্গে দেখা হতে হতে সেই পরশু। এক ধরনের খাঁ খাঁ শূন্যতা আর অসহনীয় বিষণ্নতায় দীপ্রর মনের মধ্যে দুখগুলো ভাসতে লাগল।

দরজায় দুটো টোকা আর গলার খুকখুক শব্দ হতেই দীপ্র আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বলল, 'ফুপা আসেন।'

'বাবা,' একটু মুচকি হেসে ফুপা বললেন, 'আজ কি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে ?'

'না ফুপা। আজও পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।'

'কিন্তু আমি যে চোখের সামনে কিছু উল্টাপাল্টা পরিবেশ অবলোকন করিতেছি।'

'আজ সকালে এমনিই ঘুমটা ভেঙে গেল।'

'উত্তম।' মাথাটা একদিকে কাত করলেন ফুপা। 'বড় উত্তম লক্ষণ। কিন্তু আজ যে আমি একটি বাক্য বর্ষণ করিতে ব্যর্থ হইলাম।'

'ঠিক আছে ফুপা, বাক্যটি আমি বলে দিচ্ছি, আরলি টু বেড এন্ড আরলি টু রাইজ...'

দীপ্র বাক্যটি শেষ করার আগেই ফুপা বলে উঠলেন, 'বড়ই চমৎকার। কিন্তু একটি দুঃসংবাদ রহিয়াছে।'

দীপ্র একটু চমকে উঠে বলল, 'কিসের দুঃসংবাদ ফুপা ?'

ফুপা কিঞ্চিৎ হাসিমুখ করে বললেন, 'চমকিয়া উঠিবার কিছু নেই বাপধন। দুঃখের সংবাদটা হচ্ছে, আমার একমাত্র গুণধর বংশধর মোঃ আন্দালিব ইসলাম ওরফে অর্ক রহমানের বোধহয় আমার মতো মাথা খারাপের রোগ ধরিয়াছে।'

'এ কথা বলছেন কেন ফুপা ?' দীপ্র একটু নড়েচড়ে বসল। 'আপনি পাগল ইয়ে মানে আপনার মাথা খারাপ— এ কথা কে বলল ?'

'আমি পাগল এ কথা অনেকেই বলে। আর আমি যে পাগল এ কথা আমিও বলি। সুতরাং এক আর এক মিলিয়া যেমন দুই হয় তেমনি তাহাদের কথা আর আমার কথা মিলিয়া হইল— আমি পাগল। তবে কথা সেটা না। কথা হইল, গতকল্য অর্ক বলিল সে আর অধ্যয়ন অর্থাৎ লেখাপড়া করিবে না। কারণ সে দেখিয়াছে, দেশ বিদেশের যত শীর্ষস্থানীয় ধনী রহিয়াছে তাহারা নাকি তেমন লেখাপড়া জানে না। তাই সে লেখাপড়া না করিয়া এখন হইতেই ধনী হইতে চেষ্টা করিবে। সে আবার জানিতে চাহিয়াছে, কীভাবে সহজে ধনী হওয়া যায় ?'

দীপ্র হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। গম্ভীর মুখে বলল, 'ঠিক আছে, আমি ওকে দেখব ফুপা। আপনাকে এ নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না।'

এরই মধ্যে হুড়মুড় করে দৌড়ে ঘরে ঢুকল অর্ক। কিন্তু ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। ডান হাতটা মাথায় নিয়ে চুলকানোর ভঙ্গিতে বলল, 'বাবা, তোমার সঙ্গে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।'

'ইহার জন্য দৌড়াইয়া আসিতে হইবে ? তা তোমার ঐ মহা গুরুত্বপূর্ণ কথাটা কী ?'

'তুমি আমাকে তিনলাখ টাকা দাও। আমি বিদেশে চলে যাব।'

'কেন ?'

'এদেশে থেকে যে কিছুই হবে না তা তুমি ভালো করেই জানো। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিদেশই চলে যাব। টাকাটা দিবে তো ?'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমার তো অতো টাকা নেই। তাই আজ থেকে প্রতিদিন এক টাকা করিয়া জমাইতে থাকিব। তিনলাখ দিন পর তুমি টাকাটা নিয়ে নিও। ঠিক আছে ?'

'বাবা, তুমি আমার কথা বুঝতে পারলে না।' অর্ক একটু চিন্তার ভাব নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। ভালো কথা, মা তোমাকে ডাকছে।'

ফুপা চলে যেতেই দীপ্র অর্ককে বলল, 'দিজ ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং। কাল থেকে তোকে যেন পড়ার টেবিল থেকে উঠতে না দেখি। আজ সোমবার। শুক্রবারের ভেতর 'ইউর এইম ইন লাইফ' মুখস্থ চাই। আদার ওয়াইজ, আমি অন্য ব্যবস্থা নেব। নাউ গেট আউট।'

অর্ক তবুও বসে রইল। মন খারাপ দেখে দীপ্র মৃদু স্বরে বলল, 'তুই লেখাপড়া করে মানুষ হবি— এটাই সবার কাম্য।'

আর কথা না বাড়িয়ে অর্ক রুম থেকে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। দরজা পেরোনোর আগেই দীপ্র তাকে ডাকল। অর্ক ফিরে আসতেই বলল, 'রাগ করলি নাকি ? এটা রাগের কথা না। আগে লেখাপড়া শেষ কর, পরে সব হবে। তোর মতো সুন্দর জামা কাপড়, প্যান্ট সার্ট, তোর বয়সী অনেক ছেলেই পায় না। তুই পাচ্ছিস। আর দশটা ছেলের চাইতে তুই অনেক ভালো আছিস। তাই একটু ভালোভাবে লেখাপড়া কর। তাহলে তুই আরো ভালো থাকবি।' তারপর কিছু সময় বিরতি নিয়ে বলল, 'ফুপুকে রেডি হতে বল। একটু আগে আগেই রওয়ানা দিতে হবে। রাস্তায় যা জ্যাম!'

অর্ক চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ঠাঁয় বসে রইল দীপ্র। কোনো কিছু ভেবে পাচ্ছে না সে। অচেনা এক শূন্যতা এসে ভর করছে সারা অস্তিত্বে। বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে সোনালি স্বপ্নগুলো। বর্ষার জলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে কষ্ট। জানালা দিয়ে রোদ এসেছে ঘরে। আলোয় চিকচিক করেছে সমস্ত ঘর। শুধু সে আলোয় আলোকিত হয় নি দীপ্র। একটা অস্পষ্ট অন্ধকার ছড়িয়ে আছে তার সমস্ত মনে।

ফুপু ঘরে ঢুকেই দীপ্রকে বলল, 'কিরে, অসুখ টসুখ হলো নাকি তোর ? মুখটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে।'

'না, এমনি।' দীপ্র মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে গুছিয়ে বলল।

'শোন, তোকে একটা কথা বলতে এলাম। তুই কি কিছু ভেবেছিস ?'

'আমি আর কী ভাবব ? এসব আমার ভাবনায় আসে না।'

'এদিকে অরুর একটা সম্বন্ধ এসেছে। পরশু ছেলের মা ও এক মামা ওকে দেখতে আসবে। কী যে করি!'

'অরকীয়া কী বলে ?'

'ওতো কিছু বলে না। কদিন ধরে দেখছি মনটা কেমন যেন ভার।'

'ঠিক আছে, দেখলেই তো আর সব কিছু হচ্ছে না। তুমি ওদের আসতে বলো। আমি কালকে বাড়ি যাব। তারপর ফিরে এসে একটা কিছু বলব।'

'সেটাই ভালো। আমার তো চিন্তার শেষ নেই। আর উনি আছেন ওনার ব্যবসা নিয়ে। ভেবেছিলাম নিজের ভাইপুতের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিব। কিন্তু কপালে যে কী আছে কে জানে। আচ্ছা তোকে একটি কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করবি না তো ?'

'কী যে বলো না ফুপু। কী মনে করব ?'

'অরুকে তোর কেমন লাগে ?'

দীপ্র মৃদু হেসে বলল, 'ভালো। খুব ভালো।'

'অরুকে তাহলে ওদের দেখাই। কী বলিস ?'

'হ্যাঁ, বললাম তো। দেখাদেখি করলেই তো আর বিয়ে হয় না। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে।'

'তুই তো এখনো নাস্তা করিস নি। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে নে। আমি ততক্ষণে রেডি হয়ে নিই।'

'আচ্ছা।'

রেডি হয়ে ঘর থেকে বের হতেই দীপ্র দেখল, বারান্দার গ্রীলে মাথা ঠেকিয়ে অরকীয়া বাইরে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। দীপ্র আস্তে আস্তে ওর পিছনে গিয়ে কানের পাশে ফুঁ দিল। চমকে উঠে অরকীয়া ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে দীপ্র ওর কপালের মাঝখানে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'এত কী ভাবছিস ?'

'দহনের কথা ?'

'কিসের দহন ?'

'হৃদয়ের।'

'কার জন্য?'

প্রশ্নটি শুনে অরকীয়া বিষণ্ন ও ক্লান্তভাবে দীপ্রর দিকে তাকায়। মায়াময়, রহস্যভরা দৃষ্টি। দু'চোখের পাপড়ি স্থির হয়ে আছে। দুধের সরের মতো তিরতির করে কাঁপছে অরকীয়ার ঠোঁট। যেন যত্ন করে বেদনার একটা ভুবন সাজিয়েছে তার সারা মুখটিতে।

'তোমার জন্য।' অরকীয়া আঙুল দিয়ে নিজের বুকের মাঝখানটা দেখিয়ে বলল, 'ঠিক এইখানে। তুমি বুঝেও বোঝা না। জেনেও জানো না।'

দীপ্র হাসল। তবে সে হাসিতে আড়ষ্টতা আছে। মৃদু একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কলেজে যাবি?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল অরকীয়া। বলল, 'তুমি যাবে না?'

'আমি যেতে চাচ্ছিলাম না, তবুও যাব। ফুপুকে ডাক্তার দেখিয়ে তারপর যাব। কাল আবার কলেজ ছুটি। শোন, কলেজে আজ তোকে প্রেমার সঙ্গে পরিচয় করে দেব।'

'তাকে আমি চিনি।'

'সেদিন প্রেমা তোর অনেক প্রশংসা করল। তুই নাকি খুব সুন্দরী আর মিষ্টি।'

মেঝের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে নিঃশব্দে বেদনার একটা হাসি হেসে অরকীয়া বলল, 'তোমার কেমন মনে হয়?'

'তুই...' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীপ্র বলল, 'তুই আসলে শেষ বিকেলের রঙিন আকাশের মতো সুন্দর। যা মানুষকে ভালো লাগাতে বাধ্য করে। মানুষের যা ছুঁতে মন চায়। কিন্তু মানুষ তা পারে না। আর ছুঁতে পারবে কিনা তাও জানে না। মানুষের মনে অতৃপ্তি রেখে অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকারে ঢেকে অন্য পৃথিবীতে চলে যায় অন্য কোনো মানুষকে আনন্দ দিতে।'

কথাগুলো শুনে অরকীয়ার মনের একতারে বেজে উঠে আনন্দের সুর অন্যতারে বেদনার সানাই। উভয়ের মিশ্রণে সে বুঝতে পারে, সে বেঁচে আছে। স্রেফ বেঁচেই আছে।

হন্তদন্ত হয়ে ফুপু এসে বলল, 'এই, তুই রেডি নাকি? চল, দেরি হয়ে গেল বোধহয়।'

'চলো।'

রিকশায় যেতে যেতে ফুপু আরো অনেক কথা বলল। দীপ্র নিবিষ্ট মনে শুনে গেল। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোটখাট ব্যাপারে উত্তর দিল। ফুপুর বলার মধ্যে এক

ধরনের প্রচ্ছন্ন ভাব রয়েছে, যাতে প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির মাঝামাঝি একটা ছোঁয়া আছে।

হঠাৎ দীপ্র দেখতে পেল, একটা চকচকে টয়োটা করোলার পেছনের সিটে প্রেমা বসে আছে। ওর পাশে মোটামতো একজন লোক বসা। কারটা একটা দামি হোটেল থেকে বেরিয়েই জ্যামে পড়ার কারণে দাঁড়িয়ে ছিল। দীপ্র গাড়িটার দিকে তাকাতেই প্রেমার চোখে চোখ পড়ল। দীপ্র একটু আশ্চর্যের ভঙ্গিতে হেসে প্রেমাকে হাত নেড়ে ইশারা করল। কিন্তু প্রেমার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হলো না। সৌজন্যতাবশত একটু হাসলও না। দীপ্রর চোখে চোখ পরার দু'সেকেন্ড পরই সে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছে। দীপ্রর একবার ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে প্রেমাকে ডাকতে কিন্তু গাড়ির সবগুলো কাচ লাগানো থাকায় চিন্তাটা বাদ দিল। তাছাড়া পাশে ফুপু বসা। ভাবল, হয়তো অফিসের কোনো কাজে প্রেমা এখানে এসেছিল। কিন্তু অফিসের কাজে হোটেলে কেন? আর গাড়ির মধ্যে ওই লোকটার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবেই বা সে বসে আছে কেন? তবে কি...! দীপ্র আর ভাবনার সুতোটাকে বেশি লম্বা করতে পারল না। ভাবনার সূত্রটায় দুর্ভাবনার মাত্রাটা একটু বেশি হওয়ায় সে আপন মনেই ভেবে নিল, বিশ্বাস একটা মূল্যবান সম্পদ।

ডাক্তারের চেম্বারে কাজ সেরে ফুপুকে রিকশায় তুলে দিয়ে দীপ্র কলেজে গেল। কলেজের আঙ্গিনায় পা দিয়েই ওর বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল। মাত্র ক'দিন হলো সে কলেজে আসে না। এরই মধ্যে কলেজের পরিবেশ কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে। একটা নতুন নতুন ভাব এসেছে সবখানে। কলেজ আঙিনায় যে একটা পুরনো ঘ্রাণ, পরিচিত পরিবেশ ছিল তা অনুপস্থিত মনে হচ্ছে।

কলেজ মাঠের এক কোনায় কান্তার সঙ্গে একটা ছেলেকে বসে থাকতে দেখে দীপ্র ভাবতে লাগল তাকে ডাকবে কিনা। এমন সময় কান্তাই ওকে ডেকে বসল।

দীপ্র মুচকি হেসে এগিয়ে গেল। যেতে যেতেই সে খেয়াল করল কান্তা ওই ছেলেটা থেকে একটু সরে বসল। তারপর ওড়নাটাকে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে কাঁধের উপর ছড়িয়ে দিল। কাছাকাছি এসেই দীপ্র বলল, 'তোমাদের ডিস্টার্ব করলাম না তো?'

'মোটেই না।' তারেকের দিকে তাকিয়ে কান্তা বলল, 'ওর সাথে তোমার পরিচয় আছে?'

'পরিচয় বোধহয় নেই, তবে দেখেছি। আমাদের ক্লাসেরই তো, না?'

'হ্যাঁ। ওর নাম তারেক। তারেক মাহমুদ।'

তারেক হাতটা বাড়িয়ে দিতেই দীপ্র হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আমার নাম তো শুনলেনই, দীপ্র।'

কান্তা হেসে বলল, 'শুধু দীপ্র নয়, দীপ্র ভদ্র।'

'হোয়াট ?' দীপ্র মৃদুস্বরে প্রতিবাদ জানাল।

'তারেক, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দীপ্র সবচেয়ে ভদ্র কিনা, তাই আমরা ওর নাম দিয়েছি দীপ্র ভদ্র। কেমন হয়েছে নামটা ? যদিও এটা মলির আবিষ্কার।'

'আপনার কথা অনেক শুনেছি।' তারেক কান্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও তো সবসময় আপনার কথা বলে।'

'সবসময় ?'

'প্রায় সময়ই।'

'তাহলে আপনাদের মনের কথা কখন হয় ?'

কান্তা হঠাৎ হাত উঁচিয়ে বলল, 'আপাতত এ প্যাঁচাল থাক। তা দীপ্র ভদ্র, তুমি এতদিন কোথায় হাওয়া হয়ে ছিলে ?'

'ফুপুকে নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম।'

'ফুপু মানে অরকীয়ার মা ?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছে ওনার ?'

'বুকের ব্যথা। বোধহয় হার্টের কোনো সমস্যা। চিকিৎসা চলছে। ওষুধের কোর্স শেষ হওয়ার পর কিছু জিনিস টেস্ট করাতে হবে।'

'ও।'

'আচ্ছা, প্রেমা, মলি ওরা কই ? কাউকে দেখছি না যে ?'

'প্রেমাও তো এতদিন উধাও হয়ে ছিল। অনেকদিন পর গতকালকে এসেছিল। আজকে এখনো আসে নি। মলি লাইব্রেরিতে আছে।'

দীপ্র দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল, 'বেলা বয়ে যায়, শুধু বয়ে যায়, এখনো হয় নি খেলা— একটু পরেই এসে পড়বে বিদায় নেবার পালা। স্যরি, সত্যিই ডিস্টার্ব করলাম। তোমরা কথা বলো, আমি মলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কাল তো আবার কলেজ বন্ধ।' দীপ্র তারেকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আজ আসি। আবার দেখা হবে, কথা হবে।'

লাইব্রেরিতে এসেই অরকীয়ার মুখোমুখি হলো দীপ্র। অরকীয়া তার দু'বান্ধবীর সঙ্গে বের হচ্ছিল। দীপ্রকে দেখতে পেয়েও পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় অরকীয়ার সামনে দাঁড়িয়ে দীপ্র বলল, 'কীরে, দেখতে পাসনি ?'

'পেয়েছি। তবে সেটা তোমার ব্যস্ততা। আমার জন্যে নয়, অন্যের জন্য। তাই ডাকলাম না। যদি ডিস্টার্ব ফিল করো এই সংশয়ে, এই সংকোচে।'

'একটু বাড়িয়ে বলছিস। তা মুখটা এমন গোমড়া করে রেখেছিস কেন?'

'বিরহে।'

'বিরহ শুধু বেদনাই বয়ে আনে না। হৃদয়ে অসীম আনন্দের ফোয়ারাও লুকিয়ে রাখে, তা কি জানিস? তুই মাঠে অপেক্ষা কর। একটু পরেই আমি আসছি। আজ রিকশায় বসে হাওয়া খেতে খেতে দুজন একসঙ্গে বাসায় ফিরব। ঠিক আছে?'

অরকীয়া মাথাটা কাত করে বান্ধবীদের সঙ্গে চলে যায়। দীপ্র লাইব্রেরির ভেতর এককোণে খুব মনোযোগ সহকারে মলিকে একটা বই পড়তে দেখল। দীপ্র ওর একেবারে পেছনে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'কী পড়ছ এত মনোযোগ দিয়ে? বিরহের না আনন্দের?'

চমকে উঠে পেছনে দীপ্রকে দেখে মলি হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'দুটোই। বিরহ আর আনন্দ দিয়েই তো এই বেঁচে থাকা।'

'তা বটে। তা কোনো খবর আছে?'

'কিসের খবর?' মলির চোখে কৌতুক খেলা করছে। বলল, 'তা যদি জানতে পারি, তবে চেষ্টা করা যায় কিছু খবর পাঠ করার।'

'থাক। খবর পরে শুনব। তার আগে বলো, তুমি কেমন আছ?'

'শুধু আমি? না আর কারো কথাও জানতে ইচ্ছে করছে?' মলি হাসতে হাসতে বলল, 'প্রেমা ভালো আছে। তবে আজ এখনো কলেজে আসেনি। কান্তা এসেছে। অবশ্য সে ব্যস্ত তার নব্য প্রাণেশ্বরকে নিয়ে।'

'ও এই কথা। সেজন্যই তো দেখলাম কান্তা মাঠের এককোণে একটা ছেলের সঙ্গে বসে আছে। কী যেন নাম...।'

'তারেক। চেনো নাকি?'

'চিনতাম না। কিছুক্ষণ আগে পরিচয় হলো। কান্তা আর তারেকের সঙ্গে কথা বলেই তো তোমার অবস্থানের কথা জানলাম।'

'ওদেরকে খুব সুখী সুখী মনে হচ্ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। সকালবেলার দোয়েল পাখির মতো।'

বড় মিষ্টি করে হাসল মলি। পরক্ষণেই মুখটায় বিষাদের ছায়া এনে বলল, 'আসলে সুখের কোনো অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ নেই। সুখ হচ্ছে অনাগত স্বপ্নের মতো। স্বপ্নটা চুপিচুপি আসে আবার হালকা শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার মতো স্বপ্নটাও ভেঙে যায়। পড়ে থাকে শুধু স্বপ্নময় সুখের ছায়া। যা স্পর্শ করা যায় না,

ধরা যায় না। শুধু নিথর স্তব্ধ হয়ে ভেসে থাকে আপন পৃথিবীর পরিমণ্ডলে।' গভীর বিষাদমাখা কণ্ঠে কথাগুলো বলে মলি দীপ্রর দিকে তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দীপ্র বলল, 'তবুও মানুষ সুখের স্বপ্ন দেখে। সুখ পেতে চায়, সুখী হতে চায়।'

'কিন্তু সুখ পায় না। মেঘলা আকাশের সূর্যের মতো লুকোচুরি খেলে সুখ।'

'বাদ দাও এসব বিরহের কথা। মলি, আমি এখন বাসায় ফিরব। প্রেমা এলে বোলো, কেমন ?'

'সেটা বলে দিতে হবে ? মশাই, আকাশে চাঁদ উঠলে কাউকে বলতে হয় না যে চাঁদ উঠেছে। তা তোমার বোনকে বোধহয় একটু আগে দেখলাম।'

'হ্যাঁ, আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমিই বলেছি। একসঙ্গে বাসায় ফিরব।'

'ঠিক আছে, তুমি তাহলে যাও। কান্তার প্রণয় পর্ব শেষ হলে ও এখানে আসবে। আমরা একসঙ্গে বের হব।'

মলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লাইব্রেরির বাইরে আসতেই দীপ্র দেখল, অরকীয়া লাইব্রেরির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। একা।

'কিরে, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? ভেতরে গেলেই পারতিস ?'

'তোমার অসুবিধা হতো তাহলে।'

'পাগলি। তোর কি মন খারাপ ?'

'সেটা তোমার জেনে কাজ নেই। চলো, বাসায় যাই।'

রিকশায় অরকীয়ায় সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাওয়ার সময় দীপ্রর মধ্যে একটা নতুন ধরনের অনুভূতি কাজ করল। একটা যুবতী মেয়ের পাশে বসায় যে নতুন অনুভূতি জাগে, সেটা দীপ্র এবারই প্রথম বুঝল। অনুভূতির চরম প্রয়াসে হৃদয় কেঁপে ওঠে, মাধুর্য ছড়ায় ধমনীতে, শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অন্তর্লীন অস্থিরতা। কী যেন বলার ছিল অরকীয়াকে, দীপ্র এখন তা মনে করতে পারছে না। শুধু ভাবছে, এ জীবন, ভুবন, সভ্যতা, সুগভীর বোধ আর অতল প্রশান্তি নিয়েই জেগে ওঠে হৃদয়ের ভালোবাসা। অন্তহীন এ ভালোবাসা নিয়েই মানুষ এগিয়ে যায় নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

অরকীয়ার কাছ থেকে দীপ্র নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই, তোর কেমন লাগছেরে ?'

'ভালো।'

'খোলা জায়গায়, খোলা বাতাসে রিকশায় চড়তে বেশ মজা, তাই না ?' গুমোট পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যই দীপ্র অরকীয়াকে জিজ্ঞেস করলো।

'হু।'

'হু হু করছিস কেন ? কথা বলতে পারিস না।'

'শুধু খোলা জায়গায়, খোলা বাতাসে রিকশায় চড়তে মজা আছে বটে, তবে আরো কিছু হলে আরো ভালো হয়।'

'সেই আরো কিছুটা কী ?'

অরকীয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে মৃদুস্বরে বলল, 'প্রিয়জনের হাতে হাত রাখা।'

অরকীয়ার কথা শুনে দীপ্র হেসে ফেলল। বলল, 'তোর কি এখন আমার হাতে হাতে রাখতে ইচ্ছে করছে ?'

'তুমি কি আমার প্রিয়জন ?'

দীপ্র একটু থমকে গেল 'এ কথার জবাবে কী বলা যায় তা এ মুহূর্তে তার মাথায় আসছে না। মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, জানা থাকলেও সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া যায় না। শুধু প্রশ্নটা শোনা যায়, অনুভব করা যায় কিন্তু অনুভূতি প্রকাশ করা হয় না।

'কী হলো ভাইয়া, কোনো অসুবিধায় ফেললাম কি ?' অরকীয়ার কণ্ঠে ব্যঙ্গাত্মক সুর।

'তুই আসলে অনেক বুদ্ধিমতী। আমার এতটুকু জানা ছিল না।'

অরকীয়ার এই ব্যঙ্গ দীপ্রর মনে একটু ছোঁয়া লাগলেও সে তা গায়ে মাখল না। কিছুটা জোর করেই দীপ্র হেসে ফেলল।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে অরকীয়া বলল, 'কৃত্রিমতা অনেক সময় ভালো লাগলেও তার কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। শত সৌন্দর্যের আড়ালেও যখন কৃত্রিমতার এই নগ্ন রূপটা মানুষ দেখতে পায় তখন সৌন্দর্যের ভাবাবেশের বদলে মানুষ বিরক্তির ছায়ায় জড়িয়ে যায়।'

'এখানে কৃত্রিমতার কী দেখলি ?'

'তোমার হাসি।'

দীপ্র হঠাৎ যেন ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। এই একটা মেয়ের কাছে নিজেকে তার ছোট মনে হচ্ছে, অর্থহীন মনে হচ্ছে নিজেকে। মনে হচ্ছে ব্যথা আর ব্যর্থতার হতাশায় সকল আনন্দ আর সুখ দূরে সরে যাচ্ছে।

'ভাইয়া, হাসি দিয়ে ভালোবাসা পাওয়া যায়, যদি সে হাসিতে আন্তরিকতা থাকে। আর ভালোবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায়, যদি সে ভালোবাসায় প্রগাঢ়তা থাকে। তবে জানো, আমার বিশ্ব জয় করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। একটা হৃদয় জয় করতে পারলেই ধন্য হব।'

নিথর, নিস্তব্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছে দীপ্র। সব কথাই তার হৃদয়ে শেলের মতো গাঁথছে। হঠাৎ অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করল দীপ্র। একটা অবসাদ এসে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত সত্তায়।

'তোমার কি খারাপ লাগছে?'

'নারে। তবে তেমন ভালোও লাগছে না।'

'কেন?' একটু উদ্বিগ্ন হয়ে অরকীয়া বলল, 'তোমাকে কোনো কষ্ট দিলাম কি? ভাইয়া শোন, তোমাকে সামান্যতম কষ্ট দেয়ার ইচ্ছাও আমার নেই। কষ্ট দেয়ার বিনিময়ে যদি শতগুণে সেটা আপনা আপনি নিজ হৃদয়ে ফেরত আসে তবে কেউ কি কাউকে কষ্ট দিতে পারে?'

'আমি আসলে কিছু বুঝি নারে। বুঝতে পারি না, সত্যি। আমার এ অক্ষমতা আমাকে প্রায়ই কুরে কুরে খায়।' দীপ্র নিজের অজান্তেই ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে একটা ঘুষি মরল।

'পৃথিবীতে আসলে সব বোঝা যায়, যদি কেউ বুঝতে চেষ্টা করে।' অরকীয়া হঠাৎ গন্ধ শোকার ভঙ্গিতে বলল, 'ভাইয়া, 'একটা গন্ধ পাচ্ছ? মিষ্টি একটা গন্ধ।' রাস্তার পাশের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে সে বলল, 'দেখো, কী সুন্দর লাল কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে! তাই তো বলি, এরকম মিষ্টি গন্ধ আসে কোথা থেকে।'

'কী যে বলিস না! কৃষ্ণচূড়ার আবার গন্ধ আছে নাকি?'

'আছে ভাইয়া, আছে। সব কিছুর মাঝেই একটা গন্ধ আছে। একটা নতুনত্ব আছে। যদি জিনিসটা প্রিয় হয়।'

গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অরকীয়ার দিকে মুখ তুলে তাকাল দীপ্র। তার চোখ দুটো ভেজা ভেজা। তবে কি অরকীয়া কাঁদছে? দীপ্র একটু অবাক হয়ে বলল, 'এই, কাঁদছিস নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে অরকীয়া ওড়না দিয়ে চোখ দুটো মুছতে লাগল। সামান্য শব্দ করে নাক টেনে বলল, 'কান্না আসে যে।'

'কেউ দেখে ফেলবে।' দীপ্র ফিসফিসিয়ে বলল।

'কাউকে দেখাবার জন্য কাঁদি নি।' একটু থেমে আবার বলল, 'কাঁদার ইচ্ছাতেও কাঁদি নি। হঠাৎ কান্না এলো, তাই।'

'স্যরি। কান্নার মধ্যেও যে একটা আনন্দ আছে, সুখ আছে, সেটা জানিস?'

'হয়তো। তবে একটা নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি পেলে মৃত্যুকে বেছে নিতাম। যেন পুণর্জন্মে এ জীবনের ব্যর্থতাগুলো দূর করতে পারি।'

'পুণর্জন্মেই যে ব্যর্থতাগুলো দূর করা যাবে এ গ্যারন্টিই বা কীভাবে পাওয়া যাবে ?' দীপ্র অরকীয়ার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'তুই কি নিজেকে ব্যর্থ ভাবিস ?'

অরকীয়া অভিমানের স্বরে বলল, 'ব্যর্থই তো।'

'কীভাবে ?'

'চাওয়ার সঙ্গে যদি পাওয়ার সামঞ্জস্যতা না থাকে, তবে তো তা ব্যর্থতারই প্রমাণ।'

'কেন থাকবে না সামঞ্জস্যতা ? চাইলেই পাওয়া যায়, যদি সে চাওয়ার মাঝে আন্তরিকতা থাকে।'

'ভুল বললে। প্রিয় কিছু চাওয়ার সময় মানুষ খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই চায়। তবে আন্তরিকতাময় চাওয়াতেই যদি সব পাওয়া যেত তাহলে ব্যর্থ বলে কোনো শব্দ অভিধানে থাকত না। আর পৃথিবীর মাটিতে কান্নার জলের লোনা মিশ্রণ বন্ধ হয়ে যেত।'

'এটাও ঠিক না। পাওয়াতে চাওয়ার আনন্দ শেষ হবার ভয়েও অনেকে পেতে চায় না। সারাজীবন তারা না পাওয়া নিয়েই হাসিতে কাটিয়ে দেয়।'

'তারা মহৎ। তারা মহান।'

'তোর মহৎ হতে ইচ্ছে করে না ?'

'না। না পাওয়ার বেদনা মহত্বের সব কিছু ডুবিয়ে দেয়, ভাসিয়ে দেয়। এটা নিশ্চয় মঙ্গলজনক নয়।'

'হয়তো।'

'ভাইয়া, মেয়েদের কাছে ভালোবাসা তার প্রাণ, তার হৃদয়। যদি সেটারই অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে তো সে মৃত।'

অরকীয়া মাথাটা নিচু করে ফেলল। ওড়না চাপা দিয়ে নাক টানল। দীপ্র এবার আর ওর দিকে তাকাল না। ব্যথার একটা ভাব হৃদয়ে আসন পাতছে, সিক্ত হওয়ার তার প্রয়োজন নেই।

দীপ্র একটু ইতস্তত করে বলল, 'তুই আমার কাছে যা চাইবি, তার কতটুকু যে আমি দিতে পারব, তা বুঝি না।'

'মরুভূমিতে তৃষ্ণার্তের জন্য এক ফোঁটা জলই অনেক, অন্তত প্রাণ রক্ষার্থে।'

'অরু, ইদানীং কেন যেন মনে হচ্ছে তোর কাছে আমি হেরে যাচ্ছি। না দিতে পারার অক্ষমতায় আমি নিজেকে সংকুচিত করে ফেলি। সব কিছু কেন যেন আমার কাছে ধূসর মনে হয়।'

'তুমি আসলে খুব ভালো। তোমার মনেতে যা লালন করছো, তা থেকে একটু বেরিয়ে এসো। কিঞ্চিৎ ভালো লাগাকে একটু বৃহৎ কর, দেখবে সব সুন্দর। সব মধুময়।'

'আর যে মানুষ সুন্দর কিছু দেখার পরও স্থির থাকে?'

অরকীয়া কিছু না বলে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে দীপ্রর দিকে তাকায়। একটা কিছু বলতে গিয়েও সে নিজেকে সামলে নেয়।

দীপ্র একটু গম্ভীর ভাবে বলল, 'তোর সৌন্দর্যের মাধুর্য আমি দেখি, অনুভব করি। কিন্তু সে সৌন্দর্য স্পর্শ করতে পারি না। সৌন্দর্যের ভাবাবেশে আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। তবুও।'

হঠাৎ রিনিঝিনি করে উঠল অরকীয়ার হৃদয়। বুকের ভেতর থেকে লাফাতে লাফাতে ঠেলে আসা আনন্দ আর উত্তেজনায় দীপ্রর হাতটা ধরতে গিয়েই কঠোরভাবে নিজেকে ফিরিয়ে নিল সে। ভাবল, এখনো সময় হয় নি।

বাসাটা খুঁজে পেতে তেমন অসুবিধা হলো না দীপ্রর। ঠিকানা সে কলেজের কেরানির কাছ থেকে যোগাড় করেছে। মলি কিংবা কান্তার কাছ থেকে ঠিকানাটা নেয়া যেত কিন্তু তাতে ওদের মনে 'কেন যাওয়া হচ্ছে?' 'কী করা হবে?' ইত্যাদি প্রশ্ন জাগতো। তাছাড়া সে প্রেমার বাসায় যাচ্ছে, এ কথা কেউ জানুক, তা সে চায় না। কিন্তু এটা কি প্রেমাদের বাসা? বাসার নাম্বার ঠিক আছে কিনা, দীপ্র পকেট থেকে ঠিকানাটা নিয়ে দেখল। সব তো ঠিকই আছে। তারপরও বাসার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল, এত সুন্দর ও দামি বাসায় প্রেমা কীভাবে থাকে?

কলিং বেলটা টিপে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল দীপ্র। কেউ আসছে না। বেলটা আবার যখন টিপতে যাবে তখনই দরজাটা খুলে গেল। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। দশ বারো বছরের একটা ছেলে। মায়া মায়া চেহারা। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে দীপ্র বলল, 'এটা কি প্রেমাদের বাসা?'

'জি।'

'প্রেমা আছে?'

ভেতর থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠ শোনা গেল, 'কেরে প্রীতম?'

বলতে বলতে মেয়েটি এগিয়ে এসে দীপ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি?'

'দীপ্র।'

'ও দীপ্র ভাইয়া!' মেয়েটি প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'ভেতরে আসুন।'

'তুমি আমাকে চেন?' দীপ্র ভেতরে আসতে আসতে বলল, 'স্যরি, তোমাকে তুমি করে বলে ফেললাম।'

'আমাকে তুমিতে মানায় না?'

'না। অনেক বড় হয়ে গেছ তো।'

মেয়েটি একটু লজ্জা পেয়ে ওড়নাটা ঠিকঠাক করে বলল, 'আপনার কথা কত শুনেছি। বসুন।'

'কীভাবে শুনলে?' সোফায় বসতে বসতে দীপ্র বলল।

মেয়েটি সামান্য হেসে বলল, 'আপার কাছে।'

'তোমার আপা কী বলেছে ?'

'কত কথা যে বলেছে!'

'অনেক কথা ?' দীপ্র একটু আশ্চর্যের ভঙ্গি করে রহস্যময়ভাবে বলল, 'গোপন কথা ?'

খিলখিল করে হেসে মেয়েটি একটু অস্ফুট স্বরে বলল, 'ভালো তো লাগবেই।'

ভালোভাবে শুনতে পায় নি এমনটি বুঝাতে দীপ্র বলল, 'কী বললে ? কী ভালো লাগবে ?'

চোখ দুটি বড় বড় করে মেয়েটি সামান্য ঝুঁকে বলল, 'এমনভাবে কথা বলেন, ভালো না লেগে পারে ?'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার আপা কী বলেন ?'

'ভালো না লাগলে কেউ কি কখনো কারো কথা আলোচনা করে ? আমি ও আপা দুজন পরস্পরের খুব প্রিয় বান্ধবী। আপা তো প্রায় সময়ই আপনার কথা বলে।'

হৃদয়ের মাঝখান দিয়ে হঠাৎ সুখের একটা ঢেউ জাগতেই দীপ্র বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসো।'

বসতে বসতে সে বলল, 'দীপ্র ভাইয়া, আপনার কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে আমার হিংসে হত।'

দীপ্র আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেন ?'

'আপা এত সুন্দর আর গর্ব করে আপনার কথা বলে যে, আমি প্রায়ই ভাবতাম, আপা বোধহয় আমাকে ভুলে যাবে, তাই।'

'তোমার আপা যা বলেছে সব মিথ্যে আর বাড়িয়ে বলেছে।'

'আমার চোখ তো আর মিথ্যে দেখছে না।' মৃদুকণ্ঠে বলল মেয়েটি।

'কী বললে ?'

'কিছু না।'

'সে যাক, তোমার নামটা তো এখনো জানা হয় নি। মিস...।'

'ওসব মিস টিস আমার ভালো লাগে না। শুধু প্রমী।'

'চমৎকার। প্রেমার বোন প্রমী। আর ঐ ছেলেটা... ?'

দীপ্রর কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রমী বলল, 'আমাদের ছোট ভাই, প্রীতম।'

'খুব মিষ্টি চেহারা।'

'আপনার মতো।'

'ধ্যত! তুমি যে কী বলো।'

'একদম সত্যি কথা।'

প্রমীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দীপ্র ড্রইংরুমের জিনিসপত্রগুলো দেখতে লাগল। অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে যত্ন করে রুমটাকে সাজানো হয়েছে। সব কিছু ঝকঝক চকচক করছে। এসব জিনিসপত্র নিশ্চয়ই খুব দামি। কিন্তু প্রেমা এমন কী চাকরি করে যে এত দামি জিনিসপত্র কিনে ঘর বোঝাই করতে পারে, দীপ্র ভেবে পেল না।

'দীপ্র ভাইয়া, কিছু ভাবছেন ?'

'না। ঘরের জিনিসপত্রগুলো দেখছিলাম। খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস। বেশিরভাগই বিদেশী, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে দীপ্র বলল, 'তোমাদের ছবিটা খুব সুন্দর হয়েছে।'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই বড় করে বাঁধানো হয়েছে।'

'ছবিতে শুধু তোমরা তিন ভাই বোনকে দেখা যাচ্ছে। বাবা-মা কই ?'

হঠাৎই প্রমীর চেহারায় অন্ধকার নেমে এল। বিমর্ষ একটা ভাব নিয়ে দীপ্রর দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বাবা তো মারা গেছেন।'

দীপ্র কিছুট অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'স্যরি। কিন্তু কবে ?'

'এই তো প্রায় তিন বছর হলো।'

'মা ?'

মাথাটা নিচু করে ফেলল প্রমী। চুপচাপ আনমনা হয়ে দু হাতের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকলো। দীপ্র যে প্রশ্নটি করল তা যেন সে শুনতেই পায় নি। দীপ্র এবার একটু ইতস্তত করে ডাকল, 'প্রমী।'

প্রমী চোখ তুলে তাকাল।

'মাও কি... ?' দীপ্র কথা শেষ করল না।

'না, মা বেঁচে আছেন। কিন্তু...।' প্রমী কথা থামিয়ে দিল।

'কিন্তু কী, প্রমী ?' দীপ্র উৎসুক হয়ে ঝুঁকে এলো।

'মা তো অ্যাবনরমাল হয়ে গেছেন।'

'স্যরি প্রমী। কিন্তু কীভাবে ?'

'বাবা মারা যাবার পরই মা হঠাৎ এমন হয়ে গেল। আসলে সংসারের বিভিন্ন অভাব আর সমস্যার আবর্তে পড়ে মাথা ঠিক রাখতে পারেন নি।'

'কিন্তু ঘরে এত দামি দামি আসবাবপত্র দেখতে পাচ্ছি যে।'

'এগুলো সব আপা করেছে।' প্রমী হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, 'থাক এসব। তার চেয়ে বলুন আপনার প্রিয় কবি কে?'

'পূর্ণেন্দু পত্রী।'

ড্রইংরুমের ঢোকার পরই এক কোনায় একটা বুক শেলফ দেখেছে দীপ্র। শেলফ ভর্তি বই। সামনের তাকে বেশ কয়েকটা নতুন বই সাজানো। দীপ্র একটু ঝুঁকে দেখতেই প্রমী বলল, 'ওখানে পূর্ণেন্দু পত্রীর বই আছে। যেদিন আপা শুনেছে পূর্ণেন্দু পত্রী আপনার প্রিয় কবি সেদিনই ওনার সব বই কিনে এনেছে।'

আচমকা বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠলো দীপ্রর। তবে কি প্রেমাও তাকে ভালোবাসে? কিন্তু কই, সে তো কোনোদিন তাকে এ ব্যাপারে কিছু বলে নি কিংবা আভাস ইঙ্গিতেও কিছু বোঝায় নি। যদিও দীপ্র জানে, মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না কিন্তু প্রেমা তো কেবল একজন সাধারণ মেয়ে নয়। সে তার প্রিয় বান্ধবী। তার চলাফেরা, কথাবার্তায় তো এমন কিছুই প্রকাশ পায় নি কোনোদিন। সামান্যতমও না।

'প্রমী, তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে?' দীপ্র প্রসঙ্গ বদলাল। কিছু কিছু সুখের কথা আছে যা অনেকবার শুনতে ইচ্ছে করে আবার কিছু কিছু কথা আছে যা মাত্র একবারই শুনতে মন চায়। কারণ পরেরবার শুনতে গেলে যদি তা বদলে যায়, সুখ চলে যায়, সুখের আভাস উবে যায়, সেই ভয়ে। একবার শোনার রিনিঝিনি সুখের সুরটা বুকে অনেকক্ষণ, অনেকদিন বাজতে থাকে।

'এই তো চলছে কোনোরকম।' প্রমী একটু সংকুচিত হলো।

দীপ্র মুখে দুষ্টুমির ভাব এনে বলল, 'কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে কোন মানুষটিকে তোমার খুব ভালো লাগে?'

'ভাইয়া, এটা শুধু মানুষের পৃথিবী নয়। মানুষ ছাড়াও আরো অনেক প্রাণী আছে এ গ্রহে। আছে অনেক মানুষরূপী জানোয়ারও। যাকগে, আপনার কথায় আসি। অনেক মানুষকেই আমার ভালো লাগে।'

চোখ দুটো একটু ছোট করে দীপ্র বলল, 'কোনো নির্দিষ্ট মানুষকে?'

প্রমী মৃদু হেসে লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে।'

'ধ্যাত। আমি আবার ভালো লাগার মতো কেউ নাকি?'

'অবশ্যই। অনেকের কাছে তো বটেই, আমার এবং আপার কাছেও।'

'তুমি খুব কথা বলতে শিখেছ প্রমী। মানুষকে মজাতে পারবে। নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাতেও পারবে।' হাসতে হাসতে বলল দীপ্র।

'ভাইয়া,' আহ্লাদের সুরে প্রমী দীপ্রর দিকে তাকাল। 'আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি কাউকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাব ?'

'ঠিক তা মনে হচ্ছে না। তবে...। যাকগে, বেশ কিছুক্ষণ হলো এলাম। প্রেমা কই, ওকে ডাক।'

হঠাৎ প্রমী একটু সংকুচিত হয়ে গেল। কেমন যেন নির্লিপ্ত একটা ভাব ওর চোখেমুখে ফুটে উঠল। বারবার কপালে পড়ে থাকা চুলগুলো ঠিক করছে। চুলগুলো যতবারই কপাল থেকে উপরে তুলে দেয় ততবারই কপালে ফিরে আসে। এক সময় বলল, 'দীপ্র ভাইয়া, সেই কখন এসেছেন, এখনো খালি মুখে বসিয়ে রেখেছি, স্যরি। একটু বসুন, আমি নাস্তা নিয়ে আসছি।'

প্রমী যে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য কথাটা বলল, দীপ্র সেটা টের পেলেও অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করল না। স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য সে হেসে ফেলল। হাসির রেশটা আরো একটু টেনে এনে বলল, 'এসব ফর্মালিটিজ আমার একদম ভালো লাগে না। তোমাকে কিছু আনতে হবে না।'

'ওমা, সেটা কেন ?' কৃত্রিম আশ্চর্যের ভঙ্গিতে চোখ দুটো বড় বড় করে প্রমী বলল, 'এই প্রথম এলেন।'

'প্রথম এলেই বুঝি কিছু খেতে দিতে হয় ?' দীপ্র প্রমীর দিকে তাকাতেই সে আগের মতোই আশ্চর্যের একটা ভঙ্গি করল। প্রমীর এই ভঙ্গিটা প্রথমে দীপ্রর কাছে কৃত্রিম মনে হলেও এখন সে বুঝল এটা কৃত্রিম নয়। এটা ওর স্বভাব।

প্রমীও খিলখিল করে হেসে বলল, 'অতিথিকে খালি মুখে যেতে দিতে নেই।'

'বেশ পাকামো শিখেছ তুমি। তা প্রেমাকে ডাকছ না কেন, সে কোথায় ?'

একই রকম হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে প্রমী বলল, 'কেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ?'

'কেন করবে না। সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে কার না ভালো লাগে!'

'আমি আবার সুন্দরী নাকি!' মুখটা বাঁকা করে প্রমী বলল, 'হাসি পায়।'

একটু আশ্চর্য হয়ে দীপ্র বলল, 'কেন ?'

'আমাকে কেউ সুন্দরী বললে আমার অস্বস্তি লাগে, হাসি পায়। কারণ প্রকৃত সুন্দরী যদি কাউকে বলতেই হয়, তবে সেটা আপাকেই বলতে হবে। কি, ঠিক বললাম না ভাইয়া ?'

'কারেক্ট। তা সেই প্রকৃত সুন্দরীকে এবার একটু দর্শন দিতে বল।'

'হ্যাঁ, বলছি। আপনি বসুন, আমি আসছি।' প্রমী হঠাৎ একটু তাড়াহুড়ো করে ভেতরে চলে গেল।

প্রমী ড্রইংরুম থেকে চলে যেতেই দীপ্র নড়েচড়ে বসল। প্রায় অনেকক্ষণ হলো সে এখানে এসেছে। এখনো প্রেমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। প্রেমা বাসায় আছে না বাইরে গেছে কে জানে? প্রমীও তো স্পষ্ট করে তেমন কিছু বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ একা একা বসে থাকার পর একটু অস্বস্তি বোধ করল দীপ্র। হাজারো কথা তার বুকের ভেতর ঝড় তুলছে। কিন্তু এতদিন ধরে তিল তিল করে জমানো ভালোবাসার কোমল বাক্যগুলো কীভাবে প্রেমাকে বলা যায় তাই ভেবে কুল পাচ্ছে না। কিন্তু দীপ্র আজ বদ্ধপরিকর। যত অসুবিধাই বোধ করুক, যত সংকোচই আসুক কিংবা যত বাধাই মনে হোক— আজ মনের অস্বস্তি দূর করবেই। প্রেমাকে সে সব কিছু খোলাখুলি বলবে। প্রেমার কাছ থেকেও খোলাখুলি জবাব নেবে। এমন আলো-আঁধারীর খেলা সে আর সহ্য করতে পারছে না।

দীপ্র সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। ঘরের জিনিসপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে। একটা মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই সে থমকে তাকাল। প্রায় নগ্ন একটা মেয়ে। বুক পুরোপুরি খোলা। কাঁদছে। একটি ব্যর্থ মেয়ের প্রতিকৃতি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মূর্তিটাতে। দীপ্রর ইচ্ছে হলো মূর্তিটা হাতে নিয়ে দেখে কিন্তু কী মনে করে তা ধরল না।

পূর্ণেন্দু পত্রীর একটা কবিতার বই হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দীপ্র ঘরের ভেতর পায়চারি করছে। প্রমীও আসছে না। বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ প্রীতম এসে দীপ্রর পাশে দাঁড়াল। দীপ্র ফিরে তাকাতেই দেখল প্রীতম খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখছে। চাহনিতে কিছুটা দুঃখী দুঃখী ভাব।

'তোমার নাম বোধহয় প্রীতম।' দীপ্র হেসে বলল।

'জি।' প্রীতমের মুখ গম্ভীর।

'আমাকে কিছু বলবে?'

'না।'

'ঠিক আছে, তুমি বসো। আমরা গল্প করি।'

প্রীতম বসতেই দীপ্র ওর পাশে গিয়ে বসল। তারপর পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'তোমার কি মন খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমাকে কেউ ভালোবাসে না।'

'প্রেমা আপু, প্রমী আপু, মা কেউ না?' দীপ্র ওর দিকে ঝুঁকে এল।

'হ্যাঁ। বড় আপুও না, ছোট আপুও না। আর মা তো পাগল।'

'ঠিক আছে, তোমার মন খারাপ করতে হবে না। আমি তোমাকে ভালোবাসব।' দীপ্র দু'হাতকে দুদিকে প্রসারিত করে বলল, 'এই অ্যাত্তোখানি।'

দীপ্রর কাণ্ড দেখে নিষ্পাপ হাসিতে প্রীতমের চেহারাটা উদ্ভাসিত হয়ে গেল। দীপ্র ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'আচ্ছা প্রীতম, তোমার কেন মনে হচ্ছে যে, ওরা তোমাকে ভালোবাসে না ?'

হঠাৎ প্রীতমের চেহরাটা অভিমানী হয়ে উঠল। বলল, 'ওরা আমাকে বাইরে কোথাও খেলতে দেয় না।'

'তাতে কী হয়েছে ? তুমি তো ঘরের ভেতর খেলতে পার।'

'ঘরের ভেতর কি খেলা যায় ?'

'কেন যাবে না ? তোমার আপু তো তোমাকে অনেক খেলনা কিনে দিয়েছে, না ?'

'হ্যাঁ, দিয়েছে। কিন্তু সোহেল, সুমন ওরা মাঠে গিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট আরো কত কী খেলে। এগুলো কি ঘরের ভেতর খেলা যায় ? তাও আবার একা একা।' বলতে বলতে প্রীতম তার মুখটা কাঁদো কাঁদো করে ফেলল।

চেহারায় গম্ভীর ভাব এনে দীপ্র বলল, 'তাহলে তো খুবই দুঃখের কথা। ঠিক আছে, এরপর এসে আমি তোমাকে মাঠে খেলতে নিয়ে যাব।'

'সত্যি বলছেন তো ?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

'তাহলে তিন সত্যি বলেন।'

হাসতে হাসতে দীপ্র বলল, 'সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

'আপনি খুব ভালো।'

'তাই ? আচ্ছা বলতো তুমি কী খেতে ভালোবাস ?'

'চুইংগাম।'

'চুইংগাম ? এরপর যখন আসব তোমার জন্য অনেক চুইংগাম নিয়ে আসব, ঠিক আছে ?'

প্রীতম আস্তে করে মাথাটা কাত করল।

'তোমার আপু কোথায় ?'

'ছোট আপু তো কিচেনে।'

'বড় আপু ?'

'বড় আপু তো সেই রাত্রে গেছে। এখনো আসে নি। একটু আগে ফোন করেছিল, এখনি নাকি আসবে।'

সামান্য আশ্চর্য হয়ে দীপ্র বলল, 'রাত্রে তোমার আপু কোথায় গেছে ?'

'আপু তো চাকরি করে। আপনি জানেন না ? মাঝে মাঝে আপু রাতের ডিউটি করতে যায়।'

ভীষণ চমকে উঠল দীপ্র। প্রেমা চাকরি করে ? কই, সে তো কোনোদিন শোনে নি। কান্তা কিংবা মলিও তো কোনোদিন বলে নি। প্রেমা কিসের চাকরি করে যে তাকে মাঝে মাঝে রাতে ডিউটি করতে হয় ? এদেশে মেয়েদের কী কী চাকরিতে রাতে ডিউটি করতে হয় তা একটু ভেবে দেখল দীপ্র। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারল না। মাথাটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে আসছে।

'তুমি ঠিক জানো তো প্রীতম ?'

কোনো কথা না বলে প্রীতম শুধু মাথাটা উঁচু নিচু করল।

'ওরকম করছ কেন ? কথা বল।'

'আমি এসব বলেছি, আপাকে বলবেন না কিন্তু।'

মৃদু হেসে দীপ্র বলল, 'কেন, বললে কী হবে ?'

'আপু বকবে।'

'কেন ?'

'আপু এসব বলতে মানা করেছে ?'

'হ্যাঁ।'

প্রীতমের চিবুক ধরে দীপ্র বলল, 'আপু আর কী বলেছে ?'

প্রীতম দরজার দিকে একটু ভীতি নিয়ে তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আপুরা আমাকে কারো সঙ্গে গল্প করতে দেয় না। এই যে আপনি এসেছেন, আপনার সঙ্গেও ছোট আপু কথা বলতে নিষেধ করেছে।'

অজানা এক আশঙ্কায় আবার চমকে উঠল দীপ্র। বলল, 'কেন ?'

'তাতো জানি না।'

'নিষেধ থাকা সত্ত্বেও যে তুমি কথা বলছ ?'

'একা একা ভালো লাগে না।'

'ঠিক আছে, আমি তোমার আপুদের বলে দেব। ওরা আর তোমাকে বকবে না।'

মৃদু হেসে মাথাটা কাত করার পরপরই প্রীতমের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। দীপ্র তাকিয়ে দেখল, প্রমী ঘরে ঢুকেছে। সে একটু রাগী চোখে একবার প্রীতমের দিকে তাকিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে মুখে হাসি ফিরিয়ে আনল। তারপর প্রীতমকে বলল, 'তুমি ভেতরে যাও প্রীতম।'

প্রীতম নিঃশব্দে চলে গেল। প্রীতমের জন্য দীপ্রর মনটা ছটফট করে উঠল। ছোট্ট একটা ছেলে। চাহিদার সব পাচ্ছে শুধু স্বাভাবিকতা পাচ্ছে না। এই বয়সে ছেলেরা কোথায় মাঠে মাঠে দৌড়াবে, খেলবে, তা নয়, বদ্ধ ঘরের ভেতর সারাক্ষণ বসে থাকা।

ছোট্ট টেবিলের উপর খাবারের প্লেটটা রাখতেই দীপ্র বলল, 'প্রমী, তোমাকে একটা কথা বলব।'

চোখ দুটো তুলে প্রমী বলল, 'বলুন।'

'প্রেমা কি চাকরি করে ?'

চট করে মাথাটা নিচু করে ফেলল প্রমী। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হ্যাঁ, আপনি জানতেন না ?'

'না।'

'এখন জানলেন ?'

'হ্যাঁ, প্রীতমের কাছ থেকে। আর শোন, প্রীতমকে তোমরা খুব ভালোবাস এটা জানি। কিন্তু ওর স্বাভাবিকভাবে চলার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিও না। মাঠে ওর বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতে এবং বাসায় কেউ এলে গল্প করতে দিও।'

'ও কি কোনো অস্বাভাবিক কাজ করেছে ভাইয়া ?'

'না, তা নয়। আসলে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, প্রীতম বেঁচে আছে ঠিক পাথর চাপা পড়া ঘাসের মতো। ওদের জীবন আছে, কিন্তু দুর্বল, ফ্যাকাশে।' একটু থেমে দীপ্র আবার বলল, 'তুমি আবার কিছু মনে করো না তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানোর জন্য।'

'না, না, ঠিক আছে।' প্রমী সরাসরি দীপ্রর চোখের দিকে তাকাল।

'আচ্ছা প্রমী...' একটু ইতস্তত করল দীপ্র। পরক্ষণেই বলল, 'প্রেমা কোথায় চাকরি করে তুমি জানো ?'

প্রমী চোখ দুটো নামিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'হু।'

'ঠিক আছে, কোথায় কী চাকরি করে তা প্রেমার কাছ থেকে জেনে নেব।' দীপ্র প্রমীর দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার কি মন খারাপ হলো প্রমী ?'

'না তো।'

'তুমি না বললে কী হবে, আমি বুঝতে পারছি।'

হঠাৎ কলিংবেলের শব্দ হলো। প্রমী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দরজাটা খুলতেই প্রেমা প্রবেশ করল।

স্বাভাবিকভাবে ঘরে ঢুকেই প্রেমা কিছুটা থমকে দাঁড়াল। দীপ্রকে দেখে একটু চমকেও উঠল। তারপর মুখে হাসি টেনে বলল, 'দীপ্র তুমি।'

'হ্যাঁ, আমি। দীপ্র আহমেদ।'

'ওরফে দীপ্র ভদ্র, অ্যাকরডিং টু মলি।'

'ইয়েস।' দীপ্র হাসতে হাসতে বলল।

'কখন এলে ?' প্রেমা দীপ্রর পাশে সোফায় বসল।

'বেশ কিছুক্ষণ।'

'পথ ভুলে নাকি ?'

'পথ ভুলে তো সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না প্রেমা। আমি তো সঠিক গন্তব্যেই এসেছি। সুতরাং পথটা ভুল কিংবা ভুল পথে নয়। তাছাড়া কেউ পথ না দেখালে, গন্তব্যের ঠিকানা না বললে, ভুল তো সে করতেই পারে।'

'স্যরি। তুমি কোনোদিন ঠিকানা চাও নি বলেই দেই নি। ঠিকানা পেলে কোথায় ?'

'কোথায় পেয়েছি এটা থাক, পেয়েছি ব্যস।' রহস্যের ভঙ্গিতে দীপ্র প্রেমার দিকে তাকাল।

পাশে দাঁড়নো প্রমীর দিকে তাকিয়ে প্রেমা বলল, 'ওর সাথে পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ। ও মিস... স্যরি, ও তো আবার মিস পছন্দ করে না। প্রমী।'

'ও মা! এরই মধ্যে পছন্দ-অপছন্দও জেনে নিয়েছ।'

'নিয়েছি। একজন সুন্দরীর সাথে কথা বললে তার সব জেনে নেয়া যায়।'

'দীপ্র ভাইয়া,' প্রমী কপট রাগে বলল, 'আমি তো বলেছি, আমি মোটেও সুন্দরী নই।'

'হয়েছে,' প্রেমা খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে দীপ্রকে বলল, 'কিছুই তো মুখে দাও নি দেখছি।' তারপর প্রমীকে বলল, 'তুই দীপ্রর কাছে একটু বোস। আমি ভেতর থেকে কাপড় পাল্টিয়ে আসি।'

দীপ্র কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এইমাত্র এলে, বসো। আমি একটু গল্প করেই চলে যাব।'

'আমার যে একটু গল্পতে চলবে না মশাই। তুমি বসো, আমি পনের মিনিটের মধ্যে আসছি। গোসল করব, খুব টায়ার্ড লাগছে।'

'ঠিক আছে। বেশি দেরি করো না।'

প্রেমা চলে যেতেই প্রমী সোফায় বসল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ শোনা গেল। প্রমীর মুখে অস্বস্তির একটা ছায়া দেখা গেল। দীপ্র সেটা দেখেও না দেখার ভান করে থাকল। প্রমীকে অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, 'তোমার মা বোধহয় খুব অসুস্থ।'

'হ্যাঁ, ওষুধ খেতে চায় না। একমাত্র আপাই খাওয়াতে পারে। কিন্তু খাওয়ার সময় প্রায়ই গোঙানি দিয়ে চিৎকার করে।'

'কথা বলতে পারেন তো ?'

'না। কথা বলতেও পারে না, বুঝতেও পারে না। সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে।'

'চলাফেরা করেন না ?'

'আমরা তেমন চলাফেরা করতে দেই না। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ডাক্তার বলেছে, তাতে স্ট্রোক করতে পারে।'

'চিকিৎসা চলছে কোথায় ?'

'দেশের প্রায় সব অভিজ্ঞ ডাক্তারকেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু তেমন কোনো ফল হলো না। অবশেষে ঠিক করা হয়েছে মাকে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হবে।'

'সিঙ্গাপুর!' দীপ্র তার চমকানো ভাবটা দমিয়ে রেখে বলল, 'সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, আপা ব্যবস্থা করবে।'

'প্রেমা! প্রেমা এত টাকা কোথায় পাবে' এটা বলতে গিয়েও দীপ্র সংকোচের কারণে বলল না। তবে প্রেমা এমন কী করে যেখান থেকে এত টাকা যোগাড় করে তার মায়ের চিকিৎসা করাবে ? দীপ্রর মনের ভেতর প্রশ্নটা খচখচ করতে থাকে।

'চুপ করে বসে আছ যে।' প্রেমা রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুরো রুমটা চমৎকার একটা গন্ধে ভরে গেল। দীপ্র পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রেমার দিকে তাকিয়ে থাকল। অপূর্ব লাগছে প্রেমাকে। 'নারী সুন্দর, ভেজা চুলে আরো সুন্দর' প্রেমাকে দেখে হঠাৎ এ কথাটা মনে হলো তার। প্রেমা এসে দীপ্রর পাশে বসল। সঙ্গে সঙ্গে প্রমী উঠে দাঁড়াল। দীপ্র বলল, 'তুমি যাচ্ছ কোথায় ?'

অপূর্ব একটা হাসি টেনে প্রমী বলল, 'আপনারা গল্প করুন, আমি আসছি।'

প্রমী চলে যাবার পর কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা ফুটল না। প্রেমা তার চুলগুলো বুকের কাছে এনে নাড়ছে। মাথাটা নিচু হয়ে আছে তার। দীপ্র একটা বইয়ের পাতা নাড়াচাড়া করছে। এমন সময় দুজন আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতেই ধরা পড়ে গেল। দুজনেই হেসে ফেলল। প্রেমা একটু এগিয়ে এসে বলল, 'চুপ কেন ? কিছু বল।'

দীপ্র প্রেমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলব ?'

'তোমার যা ইচ্ছা।'

'তোমার কী শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে ?'

'যা ভালো লাগায়, ভাবায়। সুখী করে এমন সব কিছু।'

'আমি তোমাকে...' বাক্যটা পুরো শেষ করার আগেই দীপ্রর বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'তুমি তো জানো আমি এখানে কেন এসেছি। মুখ ফুটে বলার আর কী আছে ?'

প্রেমা এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল। এবার মাথা তুলে বলল, 'তবুও বলো। আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

দীপ্র হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার সিংহাসনে আমি বসিব হইয়া মহারাজা।'

প্রেমাও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলল, 'ভুল করলে হবে তোমার কঠিনতর সাজা।'

পরস্পরের ছেলেমানুষি কথাবার্তায় হো হো করে হেসে ফেলল দুজনই।

হাসি থামিয়ে দীপ্র বলল, 'তুমি চাকরি কর, এ কথা তো কোনোদিন আমাকে বলে নি।'

'বলার সুযোগ আসে নি, হয়তো তাই।' গম্ভীর কণ্ঠে অথচ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রেমা বলল।

'কতদিন হয়েছে ?'

'অনেকদিন।'

'কোথায় ?'

হঠাৎ প্রেমা খুব জোরে হেসে উঠল। দীপ্র বুঝতে পারল যে হাসিটা জোর করে টেনে এনেছে। এই কৃত্রিম হাসির আড়ালে প্রেমা আসলে কী লুকাচ্ছে বা লুকাতে চাইছে আপাতত তা বোঝা যাচ্ছে না।

মুখে হাসি ধরে রেখেই প্রমা বলল, 'একেবারে উকিলের মতো জেরা করছ যে ?'

'অন্য কিছু না। স্রেফ জানতে ইচ্ছে করছে মাত্র।'

'অত জেনে কাজ নেই।'

হঠাৎ একটা ভীষণ জরুরি কথা মনে হয়েছে এমন ভাবেই দীপ্র একটু ঝুঁকে এসে বলল, 'আচ্ছা প্রেমা, সেদিন তোমাকে এক হোটেলের সামনে গাড়িতে দেখলাম। তুমিও আমাকে দেখেছিলে। কিন্তু আমাকে দেখেই মুখটা এমনভাবে ঘুরিয়ে নিলে, মনে হলো আমাকে চেনই না। কখনো দেখোই নি। কেন বলো তো ?'

চেহারায় ইতস্তত ভাব এনে প্রেমা একটু সংকুচিত হলো। খুব সাবধানে প্রেমা তার এই সামান্যক্ষণের বিমর্ষ ভাবটা কাটাতে চাইলেও দীপ্রর তা চোখ এড়াল না। সে বুঝতে পারল প্রেমা কিছু লুকাতে চাচ্ছে।

সমস্ত মেঘ কাটিয়ে সূর্যের আলোর মতো হাসি নিয়ে প্রেমা বলল, 'রাখতো ঐ সব চাকরি-বাকরির কথা। অন্য কথা বলো। বর্তমানের কথা বলো। যা আনন্দ দেয়। সুখ জাগায়।'

ভাবনার একটা কুয়াশা যে ক্রমশ মনে দানা বাঁধছে, দীপ্র তা টের পাচ্ছে। প্রেমার হাসি আর কথায় তা কিছুটা দূর হলেও অবিশিষ্ট হিসেবে যেটুকু রয়েছে তাতেই বুকটা কেমন যেন ভার হয়ে আছে।

'তুমি হয়তো জানো, যাকে ভালো লাগে তাকেই মানুষ ভালোবাসে। আর যাকে ভালোবাসা যায় তার সব কিছু জানতে ইচ্ছে করে।

'তবুও সবার একটা নিজস্বতা আছে,' কপালের চুলগুলো পেছনে টেনে নিয়ে প্রেমা বলতে লাগল, 'একটা নিজস্ব ভুবন আছে। সেই ভুবনের কথা কাউকে জানাতে ইচ্ছে করে না। জানতে দিতে চায় না। সেই ভুবন নিয়ে সে কখনো পরম সুখী। আবার কখনোবা চরম দুঃখী।'

মাথা নাড়াতে নাড়াতে দীপ্র বলল, 'তা ঠিক। তবে তোমার উপর আমার কোনো দাবি আছে কি না, অধিকার জন্মেছে কিনা, সেটা বাদ দিয়েও একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে এটা বলতে পারি, কারো সুখে সুখী যেমন হতে পারি, তেমনি তার দুঃখে দুঃখী হতেও পারি। এমনকি সেই দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে পারি।'

মুচকি একটা হাসি দিয়ে প্রেমা বলল, 'তুমি এত ভাবছ কেন দীপ্র ?

'সবার জন্যই কি একজন মানুষের ভাবনা আসে ?'

'তা আসে না। তবে বেশি ভেবেও কোনো লাভ হয় না। মানুষের ভাগ্যে যা হবার তাই হবে।'

'সেই ভাগ্যকেও পরিবর্তন করা যায়। তুমি জানো না ?'

'যদি সেটা সৃষ্টিকর্তার হাত ছেড়ে মানুষের হাত ধরে— তাহলেও ?'

নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ প্রেমার দিকে তাকিয়ে রইল দীপ্র। কী বলতে চাচ্ছে এই মেয়েটি ? কী বোঝাতে চাচ্ছে ? সব কিছু ঠিক আছে তো ? ধোঁয়াশার একটা ভাব দীপ্রর চোখের সামনে লাফালাফি করছে।

'এই, এমনভাবে তাকিয়ে আছ কেন ?'

চমকে উঠে দীপ্র বলল, 'অ্যাঁ!' তারপর প্রেমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে স্বাভাবিকভাবে বলল, 'প্রেমা তোমাকে হয়তো আমার সব ভালোবাসা দিয়ে দিচ্ছি।

তা তুমি ভালো করেই বুঝতে পারছ। যেটা দিচ্ছি সেটা হয় তুমি পাচ্ছ না কিংবা ইচ্ছে করেই নিচ্ছ না।'

'ওভাবে বলছ কেন দীপ্র ?'

'হৃদয়ের সব কিছু দেয়ার পরও যদি বোঝা যায় সেটা বৃথা, তার চেয়ে কষ্টের বোধহয় আর কিছু হতে পারে না।'

'সব কিছু বলা হয় না, বলা যায় না। যে চোখ দিয়ে চাঁদের সৌন্দর্য দেখা যায়, একদিন সে চোখ অন্ধ হলে ক্রমেই মানুষ বোধহয় সে সৌন্দর্য ভুলে যায়। অন্ধকার সমস্ত সৌন্দর্যকে ভুলিয়ে দেয়। আমাকেও তেমন ভুলিয়ে দিচ্ছে।'

'তুমি কাঁদছ ? স্যরি, নিজেকে তুমি তোমার মতই রাখো। সেটাই সুখ। সেটাই শান্তি।'

'সুখ, শান্তি ?' প্রেমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কোথায় যে সুখ আর কোথায় শান্তি মানুষ তা সত্যি বোঝে না।'

'হয়তো।'

ওড়না দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে প্রেমা দীপ্রর দিকে একটু এগিয়ে এলো। তারপর দীপ্রর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'তোমার মতো ছেলের ভালোবাসা পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। আমার শত জনমের ভাগ্য, তোমার ভালোবাসা পেয়েছি। আমি ভাগ্যবতী। তোমার সেই ভালোবাসার কুঁড়ি এই হৃদয়ে রাখলাম। দেখি ফুল ফোটে কিনা। সুবাস ছড়ায় কিনা।'

শিরশির করে ওঠে দীপ্রর বুকটা। শিহরিত আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ বেসামাল হতে ইচ্ছে করে তার। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'তুমি কুঁড়িটা যত্ন করে রেখ। দেখো, একদিন আমি ঠিকই ফুল ফুটাব।'

মৃদু হেসে প্রেমা সরাসরি দীপ্রর চোখের দিকে তাকায়। কেমন যেন একটা লজ্জা এসে ঠাঁই নেয় দীপ্রর মনে। কিসের লজ্জা, এটা সে বোঝে না। শুধু বুঝতে পারে নিজেকে এখন একা একা রাখা দরকার। সম্পূর্ণ একা।

কলিংবেলের শব্দ হতেই ওড়না দিয়ে ভালো করে চোখ দুটো আবার মুছে নিল প্রেমা। হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিকঠাক করে দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজা খুলেই শব্দ করে হেসে বলল, 'ও কান্তা, আয়।'

কান্তা ঘরে ঢুকে দীপ্রকে দেখে মুচকি হাসল। তারপর মৃদু পায়ে এগিয়ে এসে পেছন দিক থেকে দীপ্রর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'কি দীপ্র ভদ্র, একা একা চাঁদ দেখা হচ্ছে বুঝি ?'

হঠাৎ একেবারে কানের কাছে কান্তার কণ্ঠ শুনে দীপ্র ভয়ানকভাবে চমকে উঠল। মুখ ঘোরাতেই কান্তাকে দেখে মুচিক হেসে বলল, 'চাঁদ তারা একা দেখার জিনিস নাকি ?'

'সেটাই তো। কেউ কেউ ঘরের কোনায় লুকিয়ে লুকিয়ে চাঁদ দেখে আর ভাবে, সে একাই চাঁদ দেখছে, আর কেউ দেখছে না।'

'এই কান্তা, তুমি কী বুঝাতে চাইছ ?'

'কিছু না। শুধু চাঁদ দেখার কথা বলছি।'

'অ। আচ্ছা। কেউ কেউ কোনো নক্ষত্রের হাত ধরে পথ চলে। কাছাকাছি বসে গল্প করে। হেসে সেই নক্ষত্রের গায়ে লুটিয়ে পড়ে। মাঠের ঘাস মাড়িয়ে বাদাম চিবোয়। ভাবে, তারাই শুধু এই পৃথিবীতে বেঁচে আছে। আর সবাই মৃত।' পাল্টা কথা বলে দীপ্র চুপ হয়ে গেল।

'বাব্বাহ, বোবার মুখে কথার বুলি।'

'কান্তা,' একটু গম্ভীর ও কৃত্রিম রাগে দীপ্র বলল, 'কথা কম বলি মানে এই নয় যে, আমি বোবা।'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। তা কখন এসেছ ?'

'এই তো কিছুক্ষণ।'

কান্তা এবার প্রেমার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে দুষ্টুমির সুর তুলে বলল, 'গোসল করেছিস মনে হচ্ছে। চুল ভেজা।'

'হ্যাঁ, একটু আগে করলাম।'

'ভেজা চুলে তোকে খুব সুন্দর লাগে রে।'

'ওসব রাখ। তোর খবর কী ?' প্রেমার দু'চোখে খুশির স্পষ্ট আভাস।

'ভালো।'

প্রেমা আশ্চর্যের ভঙ্গিতে বলল, 'শুধু ভালো ?'

'ইদানীং কেমন যেন বোর বোর লাগে রে।'

'ঠিক হয়ে যাবে,' চোখ দুটো মটকিয়ে প্রেমা বলল, 'নিজেদের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনার চেষ্টা কর। দেখবি বেশ ভালো লাগছে।'

'ধুর, বাদ দে এসব কথা। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা কথা মনে হলো। ভাবলাম দেখা করে যাই, কথাটাও বলে যাই। কদিন ধরে কলেজে যাচ্ছিস না কেন ?'

'এমনি। মাঝে মাঝে কেন যেন গ্যাপ হয়ে যায়। তা কী যেন বলতে চাইলি ?'

'তুই তো একটা টিউশনি করতিস।'

বিমর্ষ একটা চাহনি নিয়ে প্রেমা কান্তাকে দেখল। তারপর খুব মৃদুস্বরে বলল, 'সে তো অনেক আগে।' প্রেমা একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'কিন্তু কেন ?'

প্রেমার কাশি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্র তার দিকে তাকাল। প্রেমার চোখেমুখে কেমন যেন ভীতির একটা ছায়া খেলা করছে। সে কি কোনো কারণে ভয় পাচ্ছে ? কী কারণে তা দীপ্র বুঝতে পারল না। ভাবল প্রেমাকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু নীরব সংকোচে তা আর হলো না।

কান্তা বলল, 'বাড়িতে অলস সময় কাটাতে ভালো লাগে না। তাই ভাবছি একটা টিউশনি করব।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রেমা অনেকটা ধমকের সুরে বলল, 'না, টিউশনি করতে হবে না। তারচেয়ে গল্প উপন্যাস পড়ে সময় কাটানো অনেক ভালো।'

'গল্প উপন্যাস কতক্ষণ পড়া যায় ?'

'তাহলে লেখা শুরু কর।'

'কী লিখব ?'

'কবিতা।'

'কবিতা! আমি লিখব কবিতা! পাগল।' কান্তা ভীষণ জোরে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে দীপ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দীপ্র তুমি চাঁদ দেখতে থাক। আমি আসি।'

'এখনই যাবি।' প্রেমা বাধা দিয়ে বলল, 'একটু পরে গেলে ক্ষতি কি ?'

'তুই তো জানিস, মা একটুতেই চিন্তা করে।'

'মা, না অন্য কেউ ?'

'ধুর। ওকে পাত্তা দেয় কে ? আজ থাক। কলেজে আসিস। অনেক কথা আছে।' এই বলে কান্তা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কান্তা চলে যাবার পর দীপ্র বলল, 'তুমি টিউশনি করতে নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'সময়ে মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়। রাখ তো এসব অতীতের কথাবার্তা।'

'তোমাকে আমি ঠিক ভালো বুঝতে পারি না, প্রেমা।'

'কিন্তু আমি তোমাকে বেশ বুঝতে পারি। তুমি খুব ভালো। তুমি যার হবে সে নারী বড় ভাগ্যবতী হবে।'

'তোমার ভাগ্যবতী হতে ইচ্ছে করে না ?'

'যার ভাগ্যই নেই সে আবার কীভাবে ভাগ্যবতী হয় ?'

'নিজেকে এমন করে কেন ভাবছ প্রেমা ? তুমি তো আমাকে ভাবতে পারো।'

'তোমার বিশ্বাসে যা লালন করে আসছ, একদিন যদি দেখ সেটা মিথ্যা, তখন ?'

'মিথ্যা হবেই বা কেন ?'

'তবুও।'

বেদনা ভেজা কণ্ঠে দীপ্র বলল, 'মানুষের বিশ্বাসের শিকড় এত গভীর হওয়া উচিত যেন শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও তার অস্তিত্ব না হারায়। প্রেমা, আমি নিজেকে মানুষ হিসেবে দাবি করি।'

দীপ্রর কথা শুনে তার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল প্রেমা। ক্রমশ তার চোখের কোণা ভিজে যাচ্ছে। টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষামাত্র।

দীপ্র কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে রইল। তীব্র একটা আনন্দের অনুভূতি তার সমস্ত সত্তাকে অবশ করে দিতে চাইছে। এ মুহূর্তে সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ প্রেমার দিকে এগিয়ে তার হাতের বাহু দুটো জড়িয়ে ধরল দীপ্র। নিষ্পলক, নিগুঢ় দৃষ্টিতে প্রেমা দীপ্রর দিকে তাকাল। পাথরের মতো শক্ত সে। যেন প্রাণহীন। একেবারে গাছের মতো স্থির দণ্ডায়মান। আস্তে আস্তে দীপ্র তার মুখটা নামিয়ে বলল, 'তুমি তোমাকে শুধু আমাকে দাও। আমি তোমাকে সমস্ত পৃথিবী দেব।'

রহস্যভরা কিন্তু ম্লান একটা হাসি দিয়ে দীপ্রর হাত দুটো নিজের বাহু থেকে ছাড়িয়ে নিল প্রেমা। তারপর দীপ্রর ডানহাতের আঙুলগুলো আস্তে আস্তে টানতে টানতে বলল, 'মানুষের এই পৃথিবীতে যাদের ভালোবাসে মরে যাওয়া যায়, তুমি সেরকম একজন।'

চকচকে সোনালি রোদ এসেছে ঘরে। ছড়িয়ে পড়েছে তা পুরো ঘরে। সব কিছু পরিষ্কার, সব কিছু ঝলমলে হয়ে উঠেছে। হঠাৎ এক গুচ্ছ ঠাণ্ডা বাতাস এসে গড়িয়ে পড়ল ওদের শরীরে। প্রেমার অবাধ্য চুলের গোছা আছড়ে পড়ল দীপ্রর চোখেমুখে। অন্য সময় হলে দীপ্রর বড্ড বিরক্তি লাগত। কিন্তু এখন নয়। কারণ প্রিয়তমার সব কিছু সুন্দর, আনন্দময়। ঠিক সদ্য ফোটা ফুলে বসা প্রজাপতির মতো।

বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে। মা বাবা দুজনই চিঠি পাওয়ামাত্র দীপ্রকে বাড়ি আসতে বলেছে। দীপ্র ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু গুছিয়ে বাড়ি যাবে কীভাবে ? তাছাড়া অন্তত জানতে পারত কী কারণে এত তাড়াহুড়ো করে বাড়ি আসতে হবে। তাও জানায় নি। এদিকে বাড়ি যাওয়ার আগে প্রেমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। অন্তত এটুকু জানানো উচিত, সে বাড়ি যাচ্ছে। দু'চারদিন দেখা হবে না। কারণ এ সময় প্রেমার সঙ্গে দেখা করা কিংবা কথা বলার ক্ষেত্রে অনিয়মিত হওয়া উচিত নয়। যদিও প্রেমা পরিষ্কারভাবে কোনো কিছু বলে নি। তবে দীপ্রর ভরসা এই যে, মেয়েরা মুখে অনেক কথাই বলে না, অভিব্যক্তিতে ঠিকই জানিয়ে দেয়। কিন্তু প্রেমা কি তার অভিব্যক্তিতে কোনো কিছু জানিয়েছে ? দীপ্র তেমন কিছু মনে করতে পারল না

দীপ্র ভেবেছিল কদিন পর বাড়ি যাবে। কিন্তু ফুপা, ফুপুর উৎপাতে কাল ভোরের ট্রেনেই তাকে বাড়ি যেতে হচ্ছে। ফুপু বারবার স্মরণ করে দিচ্ছে, ভাই-ভাবি এক সঙ্গে চিঠি লিখেছে, নিশ্চয় খুব জরুরি কোনো ব্যাপার। দেরি করা ঠিক হবে না। মনের মধ্যে তীব্র একটা অস্বস্তি বোধ নিয়ে দীপ্র সময় কাটাতে লাগল। বিভিন্ন ধরনের চিন্তা তার মাথায় ভর করছে। এদিকে ক্রমশ রাত ভারি হচ্ছে কিন্তু দীপ্রর চোখে ঘুম ঘুম আসছে না।

আধো ঘুম, আধো জাগরণের ভেতরই ভোর হয়ে গেল। ভালোভাবে ঘুম না হওয়ায় দীপ্রর চোখ দুটো কেমন যেন জ্বালা করছে। সঙ্গে উৎপাত হিসেবে জুটেছে মাথাব্যথা। ট্রেনের এখনো প্রায় এক ঘণ্টা বাকি। স্টেশনে যেতে সময় লাগে মাত্র বিশ মিনিট। এত তাড়াতাড়ি তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্য মনে মনে একটু বিরক্তবোধ করল সে।

বিছানা থেকেই উঠেই দেখে ডাইনিং টেবিলের উপর একগাদা খাবার। কিন্তু এই সাত সকালে এত খাবার তৈরি করতে কে বলেছে! হাতমুখ ধুঁয়ে ডাইনিং টেবিলে আসতেই ফুপু কথাটা আবার দীপ্রকে বললেন। অরকীয়া নাকি সারারাত ধরে এ খাবারগুলো তৈরি করেছে। এই নিয়ে কমপক্ষে সাতবার হলো।

'কিন্তু ফুপু, এত খাবার কেন ?'

'ট্রেনের ভেতর কী না কী খাস! তাই একটু বেশিই বানাল।'

'তার মানে ? তুমি বলছ আমি ট্রেনের ভেতর এই খাবার খাব ? অসম্ভব।'

'কেন ?'

'ট্রেনের ক্যান্টিনেই অনেক খাবার পাওয়া যায়। তাছাড়া ভ্রমণের সময় আমার তেমন খেতে ইচ্ছে করে না।'

'অরু এত কষ্ট করে বানাল, আর...' কথাটা শেষ না করেই ফুপু চুপ হয়ে গেল। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, 'ভালো কথা, শিলার জন্য কিছু পিঠা বানিয়েছি। তুই কিন্তু নিয়ে যাবি।'

'উফ! ঝামেলা। ফুপু, তুমি তো জানো এইসব খাবার টাবার বয়ে বেড়ানো আমার সহ্য হয় না। তাছাড়া...' দীপ্র কথাটা শেষ করার আগেই অরকীয়া রুমে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে দীপ্র মুখে লাগাম টানল। অরকীয়ার মুখটা থমথমে করছে। কেঁদেছে নাকি ? দীপ্র কিছু বুঝতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ভাবল, সৃষ্টিকর্তাই নাকি মেয়েদের মন বোঝে না। আর আমি তো কোন ছার!

যা যা দরকার তা রাতেই ব্যাগে ভরা হয়েছে। প্রত্যেকবার বাড়ি যাওয়ার সময় দীপ্র ভুলে টুথব্রাশটা ফেলে যায়। দু'একদিনের জন্য বাড়ি গিয়ে আর কেনা হয় না। অরকীয়া একথা জানার পর এবার বাথরুম থেকে টুথব্রাশটা এনে দীপ্রর ব্যাগে ভরে দিল। আড়চোখ অরকীয়ার কাণ্ড দেখে দীপ্র একটু মুচকি হাসল। ফুপু পিঠাগুলো একটি ব্যাগে গোছাতে ব্যস্ত। দীপ্র মনে মনে বেশ বিরক্ত হলো। কারণ ফুপু যখন একবার বলেছে তখন পিঠা তাকে নিতেই হবে। মনটা একটু খিঁচিয়ে উঠতেই ভাবল, কিছুদুর গিয়ে পিঠার ব্যাগটা রাস্তার পাশে ফেলে দিবে কিংবা কোনো গরিব মানুষকে দিয়ে দিবে। কথাটা চিন্তা করতেই দীপ্রর বুকের ভেতর একটা শান্তির ভাব জাগল ।

দু'হাত মুখের কাছে নিয়ে হাই তুলতে তুলতে ফুপা ঘরে ঢুকলেন। খালি গা। ফুপার ভুঁড়িওয়ালা খালি গা দেখে দীপ্রর বড্ড বিরক্তি লাগল। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দীপ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দেই।'

দীপ্র মনে মনে কিছুটা চমকে উঠলেও মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, 'এগিয়ে দিবেন মানে! আমি কি কচি খোকা নাকি যে পথ হারিয়ে ফেলব ?'

'ভাবলাম মর্নিং ওয়াকেই যখন যাব, তখন...।'

ফুপাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে দীপ্র বলল, 'আমি যাব রিকশায় আর আপনি পায়ে হেঁটে, সুতরাং...।'

বাক্যটা শেষ না করেই দীপ্র রহস্যময়ভাবে ফুপার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ঠিক আছে। আজ না হয় মর্নিং ওয়াকের বদলে রিকশা ওয়াকই করব।' তারপর খুব মজার কোনো কথা বলে ফেলেছেন এমন ভাব নিয়ে ফুপা হো হো করে হাসতে শুরু করলেন।

ফুপু সঙ্গে সঙ্গে কঠিন স্বরে বললেন, 'এই সাত সকালে বেহারায় মতো এত হাসছে কেন ?'

'বলে কি ?' ফুপা হাসতে হাসতেই বললেন, 'হাসি হচ্ছে সকল রোগের মহৌষধ। কিন্তু এ মেয়েমানুষটি বলে কী ? যে ঠিকমতো হাসতে জানে না, সে আবার মানুষ নাকি ? কী বলো দীপ্র বাবা ?' ফুপা সাপোর্টের আশায় দীপ্রর দিকে তাকাল। বিনিময়ে ফুপাকে শুষ্ক একটা হাসি উপহার দিয়ে দীপ্র নিজের কাজে মনোযোগ দিল।

'চেঁচিও না তো। কোনো কাজের দিকে খেয়াল নেই, সময় অসময় নেই শুধু ষাঁড়ের মতো চেঁচানো!' ফুপু রাগে গজগজ করতে থাকেন।

'বাবা দীপ্র, বায়ু গরম হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলো । মা অরু, আমার একটা শার্ট দে তো।'

ফুপা অরুর কাছে শার্ট চাইলেন বটে কিন্তু তিনি নিজেই শার্ট আনতে পাশের ঘরে গেলেন। ফুপু একটা দড়ি আনার কথা বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন। দীপ্র তখন ব্যাগের টেইনটা আটকিয়ে অরুর দিকে তাকাল। দেখল, সে মাথা নিচু করে আছে। দীপ্র কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অরকীয়াকে বলল, 'মুখটা অমন করে রেখেছিস কেন ?'

'সুখে।'

'তোর দুঃখটা কী, শুনি।'

'শুনতে হবে না। তুমি ভালো থেকো।' অরুর কণ্ঠে রাগ এবং অভিমানের মিশ্রন।

'আমি তো সারাক্ষণই ভালো থাকি।'

'ভালো।'

দীপ্র সামান্য হাসতে হাসতে বলল, 'আরো কিছু বলবি ?'

'একা একা ভালো থাকার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। কৃতিত্বও নেই। কাউকে সঙ্গে নিয়ে ভালো থাকলে সেটাই আনন্দ। সেটাই কৃতিত্ব।'

'ওমা, সুন্দর কথা বলেছিস তো।' দীপ্র পকেটে কলম খোঁজার ভান করে বলল, 'আবার বল তো, লিখে রাখি।'

'বাইরে কোথাও লিখতে হবে না। বুকের ভেতর লিখে রাখো।' অরকীয়া অভিমানী মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

খুকখুক করে কাশতে কাশতে ফুপা আবার ঘরে এলেন। ফুপু দড়ি নিয়ে প্রায় দৌড়েই এলেন। তারপর ফুপার দিকে একবার রাগী চোখে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মরার সংসার, কোনো কিছু ঠিকমতো পাওয়া যায় না।'

খুক করে কেশে ফুপুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফুপা বললেন, 'সবার সংসারে যদি মরার মানুষ থাকে, তবে জিনিসপত্র ঠিকমতো পাওয়া যায় কীভাবে?' কথাটা বলেই ফুপা মুখ উঁচু করে ঘরের সিলিংয়ের দিতে তাকিয়ে থাকলেন।

হঠাৎ জ্বলে উঠলেন ফুপু। বললেন, 'আমাকে রাগাবে না কিন্তু। সংসারে আগুন দিয়ে কিন্তু চলে যাব।'

'বাবা দীপ্র, চলো, আগুন লাগার আগেই কেটে পড়ি।'

পিঠার পোঁটলাটা অনেক কষ্টে নিজের ব্যাগে ভরল দীপ্র। পোঁটলাটা ভরতে ভরতে বিরক্তিতে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। অনেক কষ্ট করে ব্যাগে জায়গা করেছে সে। দুটো বোঝা টানার কোনো মানে হয় না।

দীপ্রকে বিদায় জানাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। রাস্তায় একটা খালি রিকশা দেখতেই ফুপা হাঁক ছেড়ে ডাকলেন। রিকশাওয়ালা ফুপাকে দেখেই হাতে থাকা জ্বলন্ত বিড়িটা ফেলে দিল। দীপ্র রিকশায় উঠবে এমন সময় ফুপু বললেন, 'ভাইজান, ভাবি, শিলা সবাইকে নিয়ে আসিস।'

দীপ্র হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়তেই ফুপা বললেন, 'অবশেষে ট্রেন ফেইল।' কথাটা যে ফুপুকে রাগাতে বলো হয়েছে, দীপ্র তা টের পেল। ফুপু রাগে গজগজ করতে লাগলেন। পাশে অরকীয়া দাঁড়িয়ে আছে। ম্লান মুখ, ভেজা ভেজা চোখ। অরকীয়াকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে দেখতে। দীপ্র তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিল। হঠাৎ দীপ্রর বুকের ভেতরটা অজানা কারণে মোচড় দিয়ে উঠল। সেই ব্যথাবোধটাকে তাড়াতেই অরকীয়ার উপর থেকে তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে রিকশাওয়ালাকে বলল, 'চলো।'

পরিষ্কার আকাশ। শীতল বাতাস বইছে। নাম না জানা অনেক পাখি ভীষণ চেচামেচি করছে। দূরে কোনো কোনো মসজিদে ফজরের আজান হচ্ছে। একদল বক সারিবেঁধে উড়ে যাচ্ছে। দীপ্র শেষবারের মতো পিছনে তাকাতেই দেখল, অরকীয়া একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

স্টেশনে পৌঁছে দীপ্র যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ফুপা সারা রাস্তায় রিকশার ওপর দু'হাত ছোড়াছুড়ি করেছেন। অভ্যাস এমনই খারাপ হয়েছে, এটা যে রিকশা, ব্যায়াম

করার জায়গা নয়, সেদিকে তাঁর কোনো খেয়ালই নেই। রিকশাওয়ালা একবার হ্যান্ডেল প্রায় বাঁকিয়ে দিয়েছিল ফুপার ঝাঁকুনিতে।

বাঁ হাতের কব্জি উল্টিয়ে ঘড়িতে সময় দেখল দীপ্র। এখনই ট্রেন ছাড়বে। দীপ্রকে আর এক দফা উপদেশ দিয়ে ফুপা বগি থেকে নামতেই ট্রেন চলতে শুরু করল। দীপ্র জানালা দিয়ে মাথা বের করে ফুপাকে দেখে আবার সিটে বসে পড়ল। ফুপা হাত নাড়লেন। দীপ্র ফিরতি বিদায় জানাতে পারল না।

ঝমঝম শব্দে ট্রেন চলছে। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে দীপ্র। হু-হু করে আসা বাতাসে তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতের আঙুল চালিয়ে চুলগুলো ঠিক করতেই ভীষণ একটা পুলক অনুভব করল সে। কতদিন পর বাড়ি যাচ্ছে।

ট্রেন চলছে। দীপ্রর ভাবনাটাও থেমে নেই। যেন অস্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছে, তার জন্য মা দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বাড়ির বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে আর শিলা ঘনঘন রাস্তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। কখন ভাইয়া আসবে। গল্প করবে। কালো রঙের জামাটা পরেছে শিলা। গত ঈদে দীপ্র জামাটা তাকে কিনে দিয়েছিল। বেশি দাম বলে বাবা কিনে দিতে চায় নি। শেষে নিজে কিছু না কিনে ওর জন্য জামাটা কিনেছে দীপ্র। ঐতো শিলা হাসছে। স্বভাবসুলভ দুষ্টু কিন্তু পবিত্র হাসি। বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকতেই তাকে দেখতে পেয়ে শিলা দৌড়ে আসছে...

'খাটাং' শব্দ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠল দীপ্র। জানালা দিয়ে রোদ এসেছে। চিকচিক করছে কামরার চারিদিক। ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় নয়টা। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। ট্রেনের গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোপুরি থেমে যাবে। জানালা দিয়ে স্টেশনের সাইনবোর্ডটা দেখেই দীপ্রর বুকের ভেতর আনন্দের এক অদ্ভুত শিরশিরে হাওয়া বইতে লাগল। সে বাড়ি এসেছে। শেকড়ের কাছে, নাড়ির কাছে। মা, বাবা, শিলা। কতদিন পর।

রিকশা নিয়ে বাড়ি পৌঁছতেই সোজা শিলার মুখোমুখি। স্বপ্নটার মতো দৌড়ে কাছে আসতে গিয়েই হঠাৎ সে থেমে গেল। মাথাটা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। দীপ্র মৃদু হেসে শিলার কাছে আসল। চিবুক ধরে মাথাটা উঁচু করতেই সে দেখল, শিলার চোখে জল টলমল করছে। কষ্ট, দুঃখ, অভিমান সব মিলিয়ে এক অভিনব দৃষ্টিতে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে আছে শিলা। দীপ্র খুব নরম সুরে কণ্ঠে আদর মিশিয়ে বলল, 'এই, রাগ করেছিস ?'

কোনো উত্তর না দিয়ে শিলা মাথাটা আবার নিচু করে ফেলল।

'এই পাগলি, কথা বলছিস না কেন ?'

'এত দেরি করলে কেন ?'

দীপ্র চোখ দুটো উল্টানোর ভঙ্গি করে বলল, 'স্যরি।'

'শুধু স্যরি বললেই কি সব শেষ হয়ে যায় ?' শিলা কণ্ঠে অভিমান।

'ঠিক আছে। তাহলে বল কী করব ? কান ধরে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকব, নাকি একশবার ওঠবস করব ?'

দীপ্রর কথা শুনে শিলা ফিক করে হেসে ফেলল। শিলার হাসি দেখে নিশ্চিত প্রশান্তিতে দীপ্রর দু'চোখ, মন জুড়িয়ে গেল। তার ছোট বোন। একমাত্র ছোটবোন। সেই কালো জামাটাই পরেছে। মাথার চুলগুলো ভাগ করে দুটো বেনি করেছে। দীপ্র কতদিন এই বেনি নিয়ে ওকে ক্ষেপিয়েছে। শিলা যত ক্ষেপেছে সে ততই বলেছে, গাধার শিং। কথাটা মনে হতেই দীপ্র হাসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শিলা দু'হাত দিয়ে দীপ্রর বাঁ হাত জড়িয়ে ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

'মা কোথায় ?'

'মিনু আপাদের বাড়িতে।'

'ওখানে কেন ?'

'চাল কুড়াতে।'

'চাল! চাল কুড়াতে কেন ?'

'কতদিন পর ছেলে বাড়ি আসছে। পিঠা খাওয়াতে হবে না ?'

মিলার চুলের একটা বেনি টান দিয়ে দীপ্র বলল, 'খুব কথা শিখেছিস, না ? বাবা কোথায় ?'

'বাজারে গেছে। তুমি যে আজকে আসবে তাতো কেউ জানে না।'

'তুই স্কুলে যাস নি কেন ?'

'কারণ কেউ না জানলেও আমি জানতাম যে তুমি আজ আসবে।'

'কী করে জানলি ?'

'মন বলেছে।'

'বাব্বাহ, তোর মন তো সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস! খুব বিউটিফুল সুন্দরভাবে সবকিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিংভাবে বুঝতে পারে।'

'ভাইয়া, তুমি কি ভেবেছ আমি লেখাপড়া জানি না ?'

'ভালো কথা, রেজাল্ট কী তোর ?'

'তুমি বলেছিলে দু শ'এর মধ্যে রোল আনতে। এনেছি।'

'গুড। আরো ভালো করতে হবে। তা অংকে কত ?'

'অনেক।' শব্দটা বলেই শিলা পিছন থেকে বেনি দুটো সামনে আনল।

'অনেক কত ? আচ্ছা ঠিক আছে। তাও ভালো ডবল শূন্য পাস নি ?'

শিলা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'আমি বুঝি ডবল শূন্য পাই।'

'সব সময় তো নয়। একবার। ঐ যে সেবার স্যার এসে বাবাকে বলতেই তুই যে ভয়ে চৌকির নিচে সারাদিন লুকিয়ে ছিলি।'

'ভাইয়া' কান্নার সুরে শিলা বলল, 'তুমি শুধু...'

'ওকে।' দীপ্র শিলার হাত ধরে উঠোনে আসল।

উঠোনের এককোনায় থাকা গন্ধরাজ গাছটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। ছয় সাতটা টবে কতগুলো আধমরা গোলাপ গাছ রয়েছে। কয়েকটা ভাঙা টবে পাতাবাহার গাছ তাদের বাহার হারিয়ে ফেলেছে। একটা মানিপ্লান্ট গাছ অনেক বড় হয়েছে। ঘরের বাঁশের বেড়াগুলো পেঁচিয়ে আছে। পাশে অনেকগুলো ছোট ছোট লতার মতো মানিপ্লান্ট গাছ উঠানে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

গন্ধরাজ গাছটিতে এই অসময়েও তিন-চারটা ফুল ফুটেছে। গাছটা নিচের চৌবাচ্চাটির পানিগুলো কেমন কালো হয়ে গেছে। দীপ্রর মনে পড়ল, সেই কবে শখ করে এই ছোট চৌবাচ্চাটি বানিয়েছিল। তারপর সাতটা তেলাপিয়া মাছ ছেড়েছিল। প্রতিদিন মাছগুলোকে খাবার দিত। একদিন সে দেখে অনেক ছোট ছোট মাছের বাচ্চা পানিতে কিলবিল করছে। আনন্দে সেদিন অনেকক্ষণ চৌবাচ্চার পাশে বসে ছিল।

দীপ্র একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে শিলাকে বলল, 'পানিগুলো কেমন ময়লা হয়ে গেছেরে।'

'তুমি বাড়ি থেকে যাওয়ার পর...' শিলা কথাটা শেষ করল না।

'তা তো বুঝতেই পারছি। গাছগুলোও কেমন মরা মরা হয়ে গেছে। তুই তো একটু যত্ন নিতে পারিস।'

'আমার এসব ভালো লাগে না।'

এমন সময় বাজারের ব্যাগ হাতে দীপ্রর বাবা বাড়িতে ঢুকলেন। দীপ্র বাবাকে দেখামাত্রই দৌড়ে গিয়ে ব্যাগটা তার হাতে নিয়ে বলল, 'এত বাজার করেছ কেন ?'

'তুই কখন এলি ?'

'এই তো কিছুক্ষণ হলো।'

'পথে কোনো অসুবিধা হয় নি তো ?'

'নাহ্। সারা রাস্তা তো ঘুমিয়েই কেটেছে।'

'ওরা সবাই ভালো তো ?'

'হ্যাঁ।'

বাবা শিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর মা কোথায় রে ?'

'মিনু আপাদের বাসায়।'

'যা, ডেকে নিয়ে আয়। কতদিন পর ছেলে এসেছে আর তোর মা ঐ বাড়িতে বসে আছে!'

'মা তো চাল ভাঙাতে গেছে।'

'পরে ভাঙালেও চলবে। তুই ডাক।'

অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও মিনু আপাদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল শিলা। বাবা এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে দীপ্রকে পাশের চেয়ারে বসতে বললেন।

দীপ্র বসতে বসতে বাবাকে বলল, 'তোমার শরীর এখন কেমন, বাবা ?'

'বেশ ভালো।'

'আমাকে এত জরুরিভাবে আসতে বললে কেন ?'

'সেটা তোর মার কাছ থেকে জানতে পারবি।'

'কোনো সমস্যা হয় নি তো বাবা ? আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছ না তো ?'

'না না, সমস্যা টমস্যা কিছু না। তোর মা এলেই জানতে পারবি।'

মা বাড়িতে ঢুকেই দৌড়ে দীপ্রর কাছে এলো। চোখেমুখে আনন্দের হাসি। দীপ্রর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এত কালো কালো লাগছে কেন তোকে ?'

দীপ্র জবাব দেয়ার আগেই শিলা দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বলল, 'কই কালো! ভাইয়াকে যা সুন্দর লাগছে না।'

'যা, হাত মুখ ধুয়ে নে। হালকা কিছু খাবি।'

'না মা, এখন কিছু খাব না।'

'তাহলে তোরা কথা বল। আমি ততক্ষণ রান্নাটা শেষ করি।'

মা চলে যেতেই শিলা দীপ্রর হাত ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলে বলল, 'ভাইয়া চল, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। তুমি চলে যাবার পর থেকে আর বাইরে বেড়ানোই হয় না।'

বাবা কিছুটা ধমকের সুরে বললেন, 'এখনই বাইরে কিসের ? বিকেলে যাস।'

'না, দুপুরে খাবার পর আমরা সবাই গল্প করব। চল ভাইয়া।'

অগত্যা শিলার হাত ধরে দীপ্র বের হলো। চিরপরিচিত এই গ্রামকে ঘিরে দীপ্রর স্মৃতিগুলো সব একে একে মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। গ্রাম্য পরিবেশে এসে দীপ্রর

মনটা অদ্ভুত এক মুগ্ধতায় ছেঁয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা সারা এলাকা ঘুরে দেখছে। রাস্তায় কারো দেখা পেলেই দীপ্র তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে। খোঁজখবর নিচ্ছে। শিলার খুব ভালো লাগছে। হঠাৎ সে বলল, 'ভাইয়া একটা কথা বলব ?'

'বল।'

'আমাকে বকবে না তো ?'

'তোর উপর রেগেছি কখনো ?'

'অরু আপাদের ওখানে অনেক সুন্দরী মেয়ে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। অনেক সুন্দর মেয়ে আছে।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে ?'

'হ্যাঁ। অনেকের সাথেই আছে।'

'তোমার কাউকে ভালো লাগে ?'

'হ্যাঁ। সবাইকে ভালো লাগে।'

শিলা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওভাবে বলছ কেন ?'

'কীভাবে বলব ?' দীপ্রর মুখে দুষ্টুমির হাসি।'

'আমি বলতে চাচ্ছি...।'

কথা শেষ করতে না দিয়েই দীপ্র বলল, 'থাক, কিছু বলতে হবে না। আমি সব বুঝেছি।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'তুই খুব বড় হয়ে গেছিস শিলা। সব বুঝতে শিখেছিস, না ?'

শিলা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'ভাইয়া, মিশু আপার কথা মনে আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা কয়েকদিন আগে বেড়াতে এসেছিল। গতকাল আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তোমার ঘরে গিয়ে তোমার বই, ছবি সব খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর তুমি কোথায় থাক ঠিকানা চাইল। ভাইয়া চল না, মিশু আপার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'এখন না, পরে।'

'জানো ভাইয়া, মিশু আপা যে কী সুন্দর হয়েছে! ঠিক পুতুলের মতো।'

দীপ্র মজা করে বলল, 'খুব সুন্দরী।'

'হু। যাবে ভাইয়া ?'

শিলার বলার ভঙ্গি দেখে দীপ্র হেসে ফেলল। তারপর তার হাত ধরে বলল, 'সব জায়গায় যেতে হয় না। সব কিছু জানতে হয় না।'

রাতে খাবারের পর মা কথা তুললেন। মার খুব ইচ্ছে অরুকে ছেলের বৌ করবে। বাবাও নীরবে সম্মতি দিলেন। দীপ্র কোনো কথা না বলে চুপচাপ সব শুনল। শিলা আগ্রহসহকারে দীপ্রর দিকে তাকিয়ে আছে।

মা বললেন, 'তোর কি কোনো অসুবিধা আছে ?'

দীপ্র একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে হবে।'

শিলা হঠাৎ দীপ্রর হাত ধরে বলল, 'অরু আপা তো খুব সুন্দরী। তোমার ভালো লাগে না ?'

শিলার মুখে বোকার মতো এমন কথা শুনে দীপ্র হেসে ফেলল। মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা কালকেই কিন্তু আমি চলে যাব।'

মা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কালকেই!'

সঙ্গে সঙ্গে শিলা চিৎকার দিয়ে বলল, 'কক্ষনো না।'

দীপ্র হাসতে হাসতে বলল, 'তোমরা সবাই চলো আমার সঙ্গে। অনেকদিন তো ফুপুর বাসায় যাওনা।'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। মাও তেমন আপত্তি করল না। আর শিলা তো এমনিতেই নাচুনে বুড়ি।

খাওয়া শেষে দীপ্র তার ঘরে এসে জানালার পাশে দাঁড়াল। ঘুম আসছে না। তারা ভরা আকাশ থেকে অঝোরে জোসনা ঝরছে যেন। সেই ফুটফুটে জোছনায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক । তবুও আজ আকাশটাকে কেমন যেন বিষণ্ন মনে হচ্ছে। আকাশের দিতে তাকিয়ে দীপ্র ভাবে, সব পেলেই কেউ সুখী হয় না। কোথাও একটা তার ছেঁড়া সুখ রয়ে যায়। নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসে যখন সে সুখের কথা মনে পড়ে, তখন কষ্টটাই বেড়ে ওঠে সমুলে। সেই কষ্টের নীরব দহন চলে বহুদিন। ততদিন, যতদিন অস্তিত্বে বোধ থাকে। বোধের রাজ্যে কষ্টসুখের দোলা থাকে। যতদিন থাকে এ জীবন।

অরকীয়ার মন ভীষণ খারাপ। সে গোমরা মুখে বসে আছে। কারো সঙ্গে কথা বলছে না। কারো প্রশ্নের জবাবও দিচ্ছে না। সেই যে সকাল থেকে একা একা বসে আছে, কোনো দিকে খেয়াল নেই। মাঝে মাঝে বালিশে মাথা গুজে শুয়ে থাকে আবার কখনো কখনো জানালা দিয়ে উদাস চোখে আকাশ দেখে। দু'চার মিনিট পরপরই মা এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে। কিন্তু তার ঐ একই জবাব, সে কারো সামনে সেজেগুজে যেতে পারবে না।

আজ অরকীয়াকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। সকাল থেকেই বাসায় একটা উৎসব উৎসব ভাব। বাবা, মা, অর্ক— সবাই ব্যস্ত। অর্কের মধ্যে কেমন যেন একটা বড়মানুষী ভাব এসেছে। সে ইচ্ছে করেই মুখটা গম্ভীর করে রেখেছে। আপুকে দেখতে আসবে, তার অনেক কাজ, এরকম একটা ভাব সে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

একটু আগে অর্ক আপুর ঘরে এসেছিল। কিন্তু আপুর গোমরা মুখ দেখে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় নি। একবার ভেবেছিল সাহস করে কিছু বলে ফেলবে কিনা, কিন্তু আপুর বকা খাওয়ার ভয়ে বলা হয় নি। মা আর কাজের মেয়েটা রান্নাঘর নিয়েই ব্যস্ত। আর বাবাতো ব্যস্ত ভঙ্গিতে বারান্দায় ঘনঘন পায়চারি করেই সময় কাটাচ্ছেন।

অর্ক ভাবল, আপুর সঙ্গে একটু কথা বলে তার মনটা ভালো করা দরকার। সে সাহস করে অরকীয়ার ঘরে গিয়েই ছোট্ট একটা কাশি দিল। ভয়েমিশ্রিত কাশিটা কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে শোনাল। অরকীয়া রাগী চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছাগলের মতো কাশছিস কেন ?'

'তোমার মনটা খারাপ কেন আপু ?'

'তাতে তোর কীরে গাধা ?'

'এসব কী আবোলতাবোল বলছ ? কিছুক্ষণ আগে বলেছ ছাগলের মতো কাশছি আর এখন বলছ গাধা। গাধারা কি কখনো ছাগলের মতো কাশতে পারে ?'

'তোর ভ্যাজর জ্যাজর বন্ধ কর তো।'

'আচ্ছা বন্ধ করলাম। কিন্তু তুমি বলো না, তোমার মন খারাপ কেন ? জানো আপু, তোমাকে যে দেখতে আসবে, সেই লোকটা না খুব সুন্দর।'

অরকীয়া মুখ তুলে অর্কের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঐ গাধাটা সুন্দর, তা তুই জানলি কেমন করে?'

'কাকে গাধা বলছ আপু? কবির ভাইয়া খুব ভালো। ওরা কবির ভাইয়ার একটা ছবি পাঠিয়েছে। সেটাই দেখেছি। খুব সুন্দর।'

'ও সব কবির খবিরের সামনে আমি যেতে পারব না। যত্তোসব ইতরের দল।'

'ইতর বল আর যাই বল, কবির ভাইদের নাকি বড় বড় অনেক ব্যবসা আছে। আচ্ছা আপু, বড় ব্যবসায়ীদের অনেক টাকা, তাই না?'

'তুই কি থামবি, না কান ধরে বের করে দেব?'

'ঠিক আছে, থামছি।' অর্ক নীরব চোখে কিছুক্ষণ অরুর দিকে তাকিয়ে থেকে পরিবেশটা বুঝে নিল। তারপর সুযোগ বুঝে বলল, 'তোমাকে আগেই একটা কথা বলে রাখছি, কবির ভাইয়া নাকি প্রায়ই বিদেশে যায়। আমিও কিন্তু বিদেশে যাব, তুমি কবির ভাইয়াকে বলে রেখ।'

কথাটা শুনে অরকীয়ার ভীষণ হাসি পেল। খুব কষ্টে হাসি চেপে রেখে রাগী চোখে অর্কের দিকে তাকাল। অর্ক বোকা বোকা একটা ভাব নিয়ে মাথাটা নিচু করে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বিদেশে নিয়ে না গেলে সে বাঁচবে না। এমন পরিবেশে অর্ককে আদর করবে না গালি দিবে, অরু তা ভেবে পেল না।

খটাং করে দরজার শব্দ করে মা প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে অর্ককে বলল, 'যা তো, বাইরে যা। ওরা এসে গেছে।'

অর্ক দৌড়ে বাইরে গেল।

অরকীয়া মার দিকে পিঠ রেখে বালিশে মাথা গুজল। তাই দেখে মা বেশ বিব্রত বোধ করলেন। কিন্তু তা প্রকাশ না করে আদরের ভঙ্গিতে অরুর মাথায় হাত রাখলেন। অরু এক ঝটকায় মায়ের হাত সরিয়ে দিল।

অরকীয়ার মা এবার একটু রেগে বললেন, 'এমন করছিস কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে অর্ক বলল, 'তুমি এত বিরক্ত করছ কেন?'

'তোর ভালোর জন্যই এসব করছি।'

'আমার ভালো দরকার নেই।'

'বললেই হলো? যখন মা হবি তখন বুঝবি।'

'আমার অত বুঝতে হবে না।'

'ঠিক আছে। তুই শুধু একবার সেজে নে। শুধু একটিবারের মতো আমার কথা শোন।'

বালিশ থেকে এক ঝটকায় মাথা তুলে অরু মায়ের দিকে তাকাল। 'তোমার সব কথা শুনব। শুধু এ কথাটা বলো না।' বলতে বলতে অরকীয়ার চোখে জল গড়াতে লাগল।

'পাগলি কোথাকার।' মা মুখে হাসি এনে বললেন, 'সামনে গেলেই তো আর বিয়ে হচ্ছে না।'

'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'একবার মনস্থির কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি কেন বুঝতে পারছ না, আমার এসব ভালো লাগছে না।'

'বললাম তো, শুধু একবার...।'

মা কথা শেষ না করে অরুর দিকে হাসি হাসি মুখ করে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিন্তু অরু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মা বললেন, 'তাহলে বল, এখন আমি কী করব?'

'আমি তো আগেই বলেছিলাম। এখন তুমি বোঝ।'

'তোকে আর একবার বলছি...।'

'না, বলতে হবে না। তুমি এখন যাও।'

'গিয়ে কী করব?'

'ওদের না করে দাও।'

'এটা কি সম্ভব?'

'অসম্ভবের কী হলো?'

'কী বলে না করে দিব?'

'তোমার ইচ্ছে।'

'আমার ইচ্ছে মানে?'

'যা ইচ্ছে হয়, তাই বল।'

'আমাকে পাগল পেয়েছিস?'

'পাগল টাগল বুঝি না। তোমার আগে খেয়াল রাখা উচিত ছিল।'

'ঠিক আছে, আমি গেলাম। তোর বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অরকীয়া সোজা হয়ে বসে বলল, 'লাভ হবে না।'

মা চলে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর বাবা খুকখুক করে কাশি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অরকীয়া সরাসরি বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবা অরকীয়ার পাশে এসে বসলেন। মুখে সামান্য হাসি টেনে বললেন, 'কী হয়েছে মা?'

'আমি এ বিয়ে করব না বাবা।'

'বেশ তো। তুই শুধু একবার ওদের সামনে যা। ওরা বুঝুক, আমার ভীষণ রূপসী একটি কন্যা আছে।'

'সেটার কি কোনো প্রয়োজন আছে বাবা?'

'হয়তো নেই। তবে ক্ষতিও নেই।'

'তুমি যদি বলো, আমি যাব। তবে তাতে যদি ঘটনা কিছু ঘটতে যায়, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।'

বিষণ্ন একটি দৃষ্টি নিয়ে বাবা অরুর দিকে এক পলক তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে বসা থেকে উঠে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে অরু প্রায় দৌড়ে এসে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। তিনি প্রায় চমকে উঠলেন। কী হচ্ছে বোঝার আগেই অরু কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাবা, তুমি রাগ করলে? তুমি রাগ করলে আমি মরে যাব বাবা।'

বাবা অরুর কাঁধ ধরে টেনে দাঁড় করালেন। বললেন, 'রাগ নয় রে, কষ্ট হচ্ছে।'

'বাবা তুমি দেখো, এ কষ্ট থাকবে না।'

'তাই যেন হয়।'

'তোমার ভীষণ মন খারাপ হয়েছে, তাই না? আমি ক্ষমা চাচ্ছি বাবা।'

অরুর মাথায় হাত দিয়ে বাবা বললেন, 'তুই সুখী হ।'

প্রচণ্ড এক কষ্ট নিয়ে অরু বাবার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি মাথাটা নিচু করে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছেন। অরুর একবার ইচ্ছে হলো, বাবাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদে। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা বাদ দিল। বাড়িতে বাইরের মানুষ রয়েছে। কান্নাকাটির কোনো শব্দ শুনলে অন্যকিছু ভেবে বসতে পারে।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল অরুর। দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানার উপর। দু'হাতে বালিশ জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কাঁদতে থাকল। বুকের ভেতর জমে থাকা কান্না লালন করাটা যে কত কষ্টের তা কেবল সে-ই জানে, যে লালন করে। কান্নার জলে ভেসে যায় কষ্টের আবর্জনা। দুঃখের স্মৃতিচিহ্ন। কষ্টগুলো চোখের জলে ভাসাতে ভাসাতে অরকীয়া বুঝল, কাঁদলে কষ্ট কমে। যে কাঁদতে পারে সে অনেক সুখী।

বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়েছে দীপ্রর বাবা আরমান সাহেবের। এত দীর্ঘ সময় একটানা ট্রেনের সিটে বসে থাকতে থাকতে তিনি রীতিমতো বিরক্তিবোধ করেছেন। গ্রামের মানুষ তিনি। খোলা আকাশ, খোলা মাঠ দেখতে অভ্যস্ত। তাই ট্রেনের কামরার ভেতর তিনি প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলেন।

ট্রেন ঠিক সময়ই ছেড়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে আসার পর ট্রেনটা হঠাৎ গতি কমিয়ে ধীরলয়ে চলা শুরু করল। কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে পড়ল। জানা গেল লাইন ক্লিয়ার নেই। অবশেষে লাইন ক্লিয়ার হতে হতে পাক্কা দেড় ঘণ্টা। আরমান সাহেব অস্থিরভাবে ট্রেনের কামরার ভেতরই পায়চারি করতে থাকলো। বাবার কাণ্ডকারখানা দেখে শিলা মুখ টিপে হাসে। তার হাসি দেখে আরমান সাহেবের বিরক্তির মাত্রা আরো বেড়ে যায়।

শিলার মা ফিরোজা বেগম সেই যে জানালার ধারে বসেছেন, আর নড়াচড়া নেই। একবার শুধু বাথরুমে গিয়েছিলেন। ট্রেনে কিংবা বাসে উঠলেই তার বমি আসে। কিন্তু আজ কিছু হয় নি। দীপ্র মার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু মার শান্ত, ধ্যানমগ্ন ভাব দেখে বিরক্ত করে নি। ভেবেছে, অনেকদিন পর শহরে বেড়াতে যাচ্ছে। সবার সঙ্গে কত কী কথা হবে, অথবা কীভাবে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায়, মা হয়তো তাই ভাবছে।

রিকশা থেকে নেমে ব্যাগ দুটো হাতে নিয়ে দীপ্র বাসার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখল অর্ক দৌড়ে আসছে। মুখে হাসি নিয়ে ফুপু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও অরকীয়াকে দেখা গেল না। হয়তো নিজের রুমে আছে, দীপ্র ভাবল।

দীপ্রর হাত থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে অর্ক তার মামা মামির দিকে তাকাল। মামি ওকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতেই সে মাথাটা নিচু করে ফেলল। তাই দেখে শিলা ফিক করে হেসে বলল, 'অর্ক দেখি বিয়ের বরদের মতো লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে আছে। এই, একটা রুমাল দিব নাকি?'

কথাটা শুনে অর্ক আরো লজ্জা পেয়ে পিটপিট করে শিলার দিকে তাকাল। শিলাও হাসি হাসি মুখ নিয়ে অর্কের দিকে তাকিয়ে রইল।

বারান্দায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্কর মা ফিরোজা বেগমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কেমন আছ ভাবি ?' তারপর আরমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাইজান, আপনার শরীর কেমন ?'

'ভালো।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে আরমান সাহেব বললেন, 'অরু কই ?'

'আগে ঘরে চলুন। তারপর বলি।'

ঘরে ঢুকেই দীপ্র বিছানায় উপর গা এলিয়ে দিল। শিলা অর্ককে নিয়ে উঠোনের দিকে চলে গেল। আরমান সাহেব পা থেকে জুতা খুলতে খুলতে বললেন, 'বড় বাজে জার্নি।'

কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে অর্কর মা বললেন, 'পথে কোনো অসুবিধা হয় নি তো ভাইজান ?'

'না, তা হয় নি। তবে অনেক দেরি হয়েছে। জান বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা।'

'ঠিক আছে, কথা পরে শুনব। আগে হাত মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দাও। দীপ্র, এই অবেলায় আবার শুয়ে পড়লি কেন ?'

'অরুকে কোথাও দেখছি না যে।' ফিরোজা বেগম বললেন।

'ওর কথা আর বলো না। আগে হাত মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দাও, তারপর আলাপ করব।' টেবিলে খাবার সাজাতে সাজাতে অর্কর মা বললেন, 'তোমরা আসবে একথা কল্পনাও করি নি। কতদিন পর এলে।'

টেবিলের খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে আরমান সাহেব বললেন, 'এসব কখন করলি ? এ যে দেখছি বিয়ের আয়োজন। তা অর্ক আর শিলা কই ?'

'ওদের ডাকতে গিয়েছিলাম। শিলা পরে খাবে। অর্কের সাথে গল্প করছে।'

দীপ্র তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মার পাশের চেয়ারে বসল। তারপর ফুপুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অরু কোথাও বেড়াতে গেছে নাকি ?'

ফুপু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'ওর এক বান্ধবীর বাসায়। মগবাজার।'

'কখন ?'

'কাল বিকেলে।'

'কাল বিকেলে ? এখনো আসছে না যে।'

'এসে পড়বে বোধহয়।'

'তুমি ওভাবে মুখ ভার করে কথা বলছ কেন ফুপু ? অরু রাগ টাগ করে যায় নি তো ?'

'না।'

'কোনো খবর নিয়েছ, সে ওখানেই আছে কিনা।'

'একটু আগে ওর বান্ধবী পাশের বাসায় ফোন করেছিল। অরু নাকি কাল আসবে।'

'কাল কেন ?'

'জানি না।'

'একটা অবিবাহিত মেয়েকে এভাবে বাড়ির বাইরে থাকতে দেওয়া ঠিক না।'

'আমি কী করব ? যার যা ইচ্ছা তাই করছে।'

আরমান সাহেব খাবারের প্লেট থেকে হাত তুলে বললেন, 'মিতা, ফরহাদ আসবে কখন ?'

' ও তো সাধারণত রাতে আসে।'

'ফরহাদকে খবর দেয়া যায় না ? রাত্রে আসার সময় যেন অরুকে সঙ্গে নিয়ে আসে।'

'ওর বোধহয় সময় হবে না ভাইজান।'

ফিরোজা বেগম দীপ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা, তুইই যা না। মেয়েটাকে কতদিন হলো দেখি না।'

দীপ্র কিছু না বলে একমনে খেতে লাগল। হঠাৎ শিলা দৌড়ে এসে বলল, 'ফুপু, অরু আপাকে নাকি কালকে দেখতে এসেছিল ?'

ফুপু অস্ফুট স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

আরমান সাহেব মুখ তুলে তার বললেন, 'কিরে মিতা, এ কথা তো আমাদের বললি না।'

'কী বলব ভাইজান! অরুকে দেখতে এসেছিল বটে, কিন্তু সে ওদের সামনে যায় নি।'

ফিরোজা বেগম একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'কেন ?

'জানি না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মিতা বললেন, 'অরুকে যতবারই বলি, ও ততই গো ধরে। তার এক কথা, সে ওদের সামনে যাবে না।'

'বুঝিয়ে বলিস নি ?' আরমান সাহেব হাত ধুতে ধুতে বললেন।

'কতবার বুঝালাম। এটাও বলেছি, দেখলেই তো আর বিয়ে হচ্ছে না। তবুও তার এক কথা, যাবে না।'

'এমন করলো কেন ?'

'আমি কী করে বলব, ভাইজান।'

'কে কে এসেছিল ?'

'ছেলে, ছেলের এক মামা আর দুজন বন্ধু।'

'ছেলে কী করে ?'

'ওদের পারিবারিক ব্যবসা আছে। টাকা পয়সাও অনেক।'

শিলা হাসতে হাসতে বলল, 'তাছাড়া তিনি নাকি প্রায়ই বিদেশে যান।' তারপর মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'জানো মা, অর্ক নাকি অরু আপুকে বলেছিল, ওনার বিয়ের পরে তার স্বামীকে বলতে, যেন অর্ককে বিদেশ নিয়ে যায়।'

শিলার কথা শুনে আরমান সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ বাবা। আপু বিয়ে না করায় ওর যা দুঃখ!'

'বিদেশ যেতে না পারার ?'

'হ্যাঁ। বিদেশে নাকি অনেক টাকা। তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া যায়।'

'পাগল ছেলে।'

'আরো কত কী বলল।' শিলা এবার দীপ্রর দিকে বলল, 'ভাইয়া, অরু আপাকে তুমি গিয়েই তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে নিয়ে আস না।'

ফিরোজা বেগম বললেন, 'শিলা ঠিকই বলেছে। দীপ্র, নিয়ে আয় না মেয়েটাকে।'

দীপ্র খাওয়া শেষ করে বেসিনে হাত ধুতে ধুতে ফুপুকে বলল, 'অরুর বান্ধবীর বাসার ঠিকানাটা দাও তো।'

ফুপু ঠিকানাটা দিতেই দীপ্র রওয়ানা দিল। মগবাজারে পৌঁছে নাম্বার মিলিয়ে বাসা খুঁজে বের করতে খুব একটা সময় লাগল না। একতলা বাড়ি। দোতলার অসম্পূর্ণ কাজ যে অনেকদিন যাবত বন্ধ আছে ইটের ওপর পড়া শ্যাওলাগুলো তাই বলছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেলটা টেপার কিছুক্ষণ পর মৃদু শব্দে দরজাটা খুলে গেল। ওপাশ থেকে একটি মেয়ে বলল, 'কাকে চাই ?'

মেয়েটাকে দেখে দীপ্র কেন যেন সামান্য চমকে উঠলেও মুখে হাসি টেনে বলল, 'এখানে অরু আছে ?

'অরকীয়া ? হ্যাঁ, আছে। কিন্তু আপনি...' মেয়েটি একটু সংকোচ বোধ করল।'

'আমি দীপ্র। ওর...।'

কথাটা শেষ করার আগেই মেয়েটি বলল, 'ও বুঝেছি। আপনার কথা অরুর কাছে সহস্রবার শুনেছি। ভেতরে আসুন।'

দীপ্র ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি দরজা বন্ধ করল। তারপর দীপ্রর দিকে চালাকি চালাকি একটা হাসি দিয়ে বলল, 'আমি অরুর বান্ধবী স্মৃতি। আপনি বসুন। আমি অরুকে ডেকে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পর অরকীয়া নিঃশব্দে দীপ্রর সামনে এসে দাঁড়াল। দীপ্র মুখ তুলে তাকাতেই বলল, 'তুমি ?'

'তোকে নিতে এলাম।'

'বাড়ি থেকে কখন এসেছ ?'

'এই তো বিকেলে। বাবা, মা এবং শিলাও এসেছে। চল।'

'কোথায় ?' ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে একটা ট্রে হাতে ঢুকতে ঢুকতে স্মৃতি বলল, 'সময় বয়ে যাচ্ছে কি ?'

টেবিলের উপর ট্রে-টা রাখতেই অরু তার হাত ধরে বলল, 'আমার বান্ধবী স্মৃতি।'

'পরিচয় হয়েছে। কিন্তু ও তো স্মৃতি নয়, এখনো দিব্যি সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

স্মৃতি একটু হেসে বলল, 'তা বটে। কিন্তু স্মৃতি হতে কতক্ষণ ?'

'হয়তো জীবনটাই একটা স্মৃতি।'

'ঠিক আছে, এখন স্মৃতির কথা থাক।' টেবিলের ওপর খাবারগুলো দেখিয়ে বলল, এবার এগুলোর সৎকার হোক।'

'আপনিও বসুন।' দীপ্র বলল।

স্মৃতি বসতেই দীপ্র বলল, 'কলেজ কেমন লাগছে।'

'ভালো না।'

'বলেন কী ? এ বয়সে ভালো না লাগলে কখন লাগবে ?'

'ভালো লাগার কিছু নেই যে।'

'তাই নাকি ?' দীপ্র চোখ দুটো উল্টিয়ে কৃত্রিম আশ্চর্যের ভান করে বলল, 'তাহলে তো ভালো লাগার কিছু ম্যানেজ করতে হয়।'

স্মৃতি লাজুক ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'মন্দ হয় না। তবে এখানে একটা কথা আছে, ভালো লাগার কিছু থাকলেই যে হবে তা নয়। সেই ভালো লাগাকে তো আবার পেতে হবে, নাকি ?' কথাটা বলেই আড়চোখে অরকীয়ার দিকে তাকাল। অরু চোখ দুটো নামিয়ে নিল।

'সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়।' দীপ্র হেসে বলল, 'আমার কথা নয়, মহা মানুষদের কথা।'

'আপনিও তো একজন মহা মানুষ।'

'ধ্যাত! কী যে বলেন!'

'সবার কাছে না হলেও অন্তত একজনের কাছে। যে সব সময় আপনার কথা স্মরণ করে।'

দীপ্র মুখটা হঠাৎ গম্ভীর করে ফেলল। কিছুক্ষণ মাথাটা নিচু করে রেখে অরকীয়ার দিকে তাকাল। তার চোখে অপরাধবোধ এবং কাতরতার ছায়া দেখতেই দীপ্রর বুকের ভেতরে কষ্টের বুদবুদ উঠতে শুরু করল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'চল, রাত হয়ে গেছে।'

স্মৃতি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'দীপ্র ভাইয়া, আমার কোনো কথায় কষ্ট পেলেন না তো?'

'নাহ্। তা কেন? বরং বেশ ভালো লাগল, আমার মতো মানুষকে কেউ কেউ স্মরণ করে জেনে।'

'কেউ কেউ কিনা জানি না। তবে একজনের কথা জানি।'

দীপ্র উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে অরকীয়া এবং স্মৃতিও উঠে দাঁড়াল। দীপ্র দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই স্মৃতি বলল, 'অরু আজ থেকে গেলে আমার বেশ ভালো লাগত। কিন্তু ওর ভালো লাগবে বাসায় গেলে। ওর ভালোবাসারই জয় হোক।' তারপর মিষ্টি হেসে বলল, 'ভাইয়া, আবার আসবেন তো?'

'তোমার মতো চমৎকার একটি মেয়ের কথা আমার বেশ মনে থাকবে। ও স্যরি, তুমি বলে ফেললাম।'

'আমি সেটাই চাচ্ছিলাম।'

বাসা থেকে বেরিয়েই রিকশার জন্য দীপ্র রাস্তায় এসে দাঁড়াল। স্মৃতি অরকীয়ার হাত ধরে হেসে হেসে কী যেন বলছে। একটা খালি রিকশা দাঁড় করাতেই অরকীয়া আর স্মৃতি এগিয়ে এলো। অরকীয়া উঠে বসার পর দীপ্র রিকশায় চড়ল। তারপর স্মৃতির দিকে এক টুকরো হাসি ছুড়ে দিয়ে বলল, 'আসি। ভালো থেকো।'

রিকশা চলতে শুরু করতেই অরকীয়া ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকাল। স্মৃতি এখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। অরুকে তাকাতে দেখেই হাত নাড়ল। হঠাৎ স্মৃতির জন্য মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল অরুর।

কিছুক্ষণ পর দীপ্র আড়চোখে অরকীয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফুপা ফুপুকে কষ্ট না দিলেই পারতিস।'

দীপ্রর দিকে না তাকিয়েই একটু দৃঢ় স্বরে অরকীয়া বলল, 'কষ্ট আমারও নেহায়েত কম নয়।'

'এখন বোধহয় নেই, তাই না ?

'কে বলল নেই ? বেঁচে থাকাই তো কষ্টের। যদি সে বেঁচে থাকায় চাওয়া আর পাওয়াতে মিল না হয়।'

'না পাওয়াতেও অনেক সময় মানুষ সুখী হয়।'

'হ্যাঁ, যদি সে না পাওয়াতে চাওয়ার চাহিদা শেষ হয়ে যায়। আমার চাওয়ার চাহিদাও শেষ হবে না, আমি সুখীও হব না।'

'ছেলেটা তো বেশ ছিল।'

'সার্টিফিকেট দিচ্ছ ?'

'না, মন্তব্য করলাম।'

'সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে আমার এত বেশি ভালোর দরকার নেই। যাকে নিয়ে সুখী হওয়া যায় আমার শুধু তাকেই দরকার।'

'ওকে বিয়ে করলে তুই সুখী হতিস না, এটা কে বলল ?'

'তুমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারো, আমি সুখী হতাম ? আসলে তুমি যে কীসে সুখী হও সেটা নিজে যতটা জানো, বোধহয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও ততটা জানে না।'

দীপ্র হঠাৎ চমকে উঠল। সত্যিই তো, সবার একটা নিজস্ব চাওয়া আছে। সেই চাওয়া আর পাওয়াতেই তো সুখের সূত্রতা। তাই প্রত্যেক মানুষ সেই চাওয়ার পাওয়াকে খোঁজে। তাতে সুখ পেতে চায়। সুখী হতে চায়।

'তবে কি জানিস, অন্যকে সুখী করেও কিন্তু নিজে সুখী হওয়া যায়।'

'যদি তোমাকেই এ কথাটি বলি ?'

হঠাৎ পরাজিত মানুষের দৃষ্টি নিয়ে দীপ্র অরকীয়ার দিকে তাকায়। অরকীয়া গম্ভীরভাবে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। বেশ কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা ফুটল না। হঠাৎ অরকীয়া বলল, 'আমি আমার চাওয়াকেই চাই। নচেৎ...।'

দীপ্র স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'নচেৎ কী ?'

'সেটা সময়ই বলে দেবে।'

'খুব সাহসী হয়েছিস মনে হয় ?'

'ভালোবেসে মেয়েরা হয় সাহসী, শোন নি কথাটা ?'

আশ্চর্য দৃষ্টিতে আবার অরকীয়ার মুখের দিকে তাকাল দীপ্র। সত্যি, মেয়েদের জানা খুব কঠিন। ওরা কখন সাহসী, কখন ভীতু, সেটা সময় এবং পরিবেশই বলে দেয়। হঠাৎ রিকশাওয়ালা বলল, 'ছার, আইস্যা পড়ছি। কুন বাসাটা ?'

ভাবনায় ছেদ পড়তেই সামান্য চমকে ওঠে দীপ্র। বলল, 'ডান দিকের গলির প্রথম বাসাটার সামনে দাঁড়াও।'

বাসার সামনে রিকশা থামার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্রর ফুপু দৌড়ে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে দীপ্রর হাত ধরে চিৎকার করে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছেরে দীপ্র।'

কী হয়েছে তা শোনার আগেই অরকীয়া রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'বাসার বাইরে চিৎকার করছ কেন ? আগে ঘরে চল।'

ঘরে ঢুকেই অরকীয়া মামিকে উদ্বিগ্ন দেখে বলল, 'কী হয়েছে মামি ?'

'তোমার মার কাছেই শোন।'

অরকীয়ার মা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'অর্ককে পাওয়া যাচ্ছে না।'

অরকীয়া কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'পাওয়া যাচ্ছে না মানে ? ভ্যানিশ হয়ে গেছে নাকি ? নিশ্চয় কোথাও আছে। কিছুক্ষণ পর ঠিকই এসে পড়বে।'

মিতা আরো জোরে চিৎকার করে বললেন, 'অর্ক তো কোনোদিন এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে না। তাছাড়া...।'

'তাছাড়া ? থামলে কেন, বল।'

ফিরোজা বেগম এগিয়ে এসে বললেন, 'বিকেলে অর্ক নাকি শিলার কাছে কী কী সব বলেছে।'

'কী বলেছে ?'

'কী সব আবোল তাবোল কথা। ওর নাকি বড়লোক হওয়ার খুব শখ। বেশ কিছু টাকা পেলে ও নাকি খুব তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে যাবে।' মায়ের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে শিলা বলল, 'বলছিল, ও নাকি বেশ কিছু টাকা যোগাড় করার চেষ্টা করছে। টাকাটা যোগাড় হলেই সে নাকি তার কাজ শুরু করে দিবে।'

'বেশ তো। এর সঙ্গে ওর পালানোর সম্পর্ক কী ?' দীপ্র বলল।

ফিরোজা বেগম শান্ত স্বরে বললেন, 'মিতা সন্ধ্যার দিকে দেখে ওর আলমারি খোলা। সেখানে হাজার পাঁচেক টাকা এবং অরুর বিয়ের কিছু গয়না ছিল। সেই হাজার পাঁচেক টাকা এবং দুটা আংটি, একটি বালা ও একটি গলার চেনের মধ্যে বালা ও চেনটা নেই।'

দীপ্র সামান্য ভেবে বলল, 'চোর হলে তো আংটিসহ নিতো।'

অরকীয়া ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'বেশ হয়েছে। ছেলেকে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে। যখন যা বলে তাই দিয়েছ। এখন বোঝ। যত্তো সব।'

মিতাও সমান তালে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমিও কম কিসে ? তুমিও তো কম জ্বালাচ্ছ না।'

দীপ্র ওর মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা কোথায় ?'

'উনি ফরহাদকে খবর দিতে গেছেন।'

এখন সময় মিতা হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আমার বুক গেল। জ্বলে গেল।'

অরকীয়া দৌড়ে এসে মার বুকে চাপ দিয়ে বলল, 'মামি, মাকে ধরুন। আমি আলমারি থেকে ওষুধ নিয়ে আসি।'

ফিরোজা বেগম মিতাকে ধরতেই অরু দৌড়ে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এল। দুটো ট্যাবলেট গিলিয়ে মাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দীপ্রকে বলল, 'ভাইয়া, কাল তুমি মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। বেশ কিছুদিন ধরেই বলা হচ্ছে কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না। ডাক্তার সাহেব দিনেরবেলা তার ক্লিনিকেই বসেন। তুমি সকালেই নিয়ে যেও।'

ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই মিতা ঘুমিয়ে পড়ল। দীপ্র ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কিছু অংশ মেঘে ঢেকে আছে। বেশ ভালো লাগছে। হঠাৎ নিঃশ্বাসের শব্দ হতেই দীপ্র দেখল অরকীয়া পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কিছু বলবি ?'

'না। শুধু তোমার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আকাশের চাঁদ দেখব।'

দীপ্র কিছু না বলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। অরকীয়া একটু এগিয়ে এসে দীপ্রর একেবারে পাশাপাশি দাঁড়াল। ওর ভীষণ ইচ্ছা করল দীপ্রর হাত ধরার। কিন্তু সাহস পেল না। হাত ধরতে না পারার অসহ্যতায় অরকীয়া গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চাঁদের দিকে তাকাল। আধো মেঘে ঢাকা চাঁদটাকে ভীষণ রহস্যময় মনে হচ্ছে আজ। মানুষের মনের চাইতেও হাজারগুণ বেশি রহস্যময়।

ঘুম আসছে না প্রেমার। বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছে। একটা অস্বস্তিবোধ তার সমস্ত অস্তিত্বে ঠাঁই নিয়েছে। এলোমেলো বিভিন্ন ঘটনা চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটা বিষয়ে চিন্তার গভীরতা শেষ হতে না হতেই আরেকটা চিন্তা এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে মনের ভেতর। কেন জানি চোখ জ্বালা করছে। শরীরটাও দুর্বল ঠেকছে। প্রেমা বুঝতে পারছে, তার ঘুমের ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। ঘুম যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে অচিন রাজ্যে।

বিছানায় উঠে বসে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল প্রেমা। ডিম লাইটের মৃদু আলোতে দেখল, প্রায় মধ্যরাত। রুমের অন্য খাটে প্রমী নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। নিঃশ্বাসে ওর বুকটা সামান্য ওঠানামা করছে। প্রমী বেশ বড় হয়ে গেছে। দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। মশারির ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো ওর মুখে পড়ায় প্রমীকে কেমন যেন বাচ্চা বাচ্চা লাগছে। প্রেমা মনে মনে ভাবে, সেই ছোট্ট প্রমী এখন কত বড় হয়ে গেছে। হায় সময়! কোনদিক দিয়ে যে দৌড়ে পালাচ্ছে, কেউ তাকে ধরতে পারছে না।

প্রেমা খাট থেকে নামল। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। বুকের ভেতরটা ছটফট করছে। হাজারো কত চিন্তা একসঙ্গে মাথায় কিলবিল করছে। যদি প্রমীর বিয়ের ব্যাপারটা সেরে ফেলা যেত ? প্রমীকে বেশ ভালো বিয়ে দেয়া যাবে। আজকাল টাকা ছড়ালে ভালো পাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু তার আগে প্রমী কি বিয়ে করতে রাজি হবে ? বড় বোনের আগে ছোট বোনের বিয়ে, এটা কী করে সম্ভব ? তবুও প্রেমা ভাবে, সে প্রমীকে বোঝাবে। তাকে বিয়ে দেয়া, প্রীতমকে মানুষ করা, মার চিকিৎসা— কত দায়িত্ব তার মাথার ওপর। প্রমীর বিয়ের দু'এক বছর পরেই সে বিয়ে করবে। কোনো অসুবিধা হবে না। সোফায় বসে বসে কল্পনার জাল বুনতে থাকে প্রেমা।

মার ঘর থেকে মাঝে মাঝে মৃদু গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। প্রেমা ভাবে, সময় সুযোগ বুঝে খুব শিগগিরই মাকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাবে।

প্রীতমটা রাতে এমনভাবে ঘুমায় যেন খাটের উপর যুদ্ধ নেমেছে। সারাদিন মনে মনে যা ভাবে, টিভিতে কার্টুন দেখে নিজেকে কল্পনায় যা সাজায়, ঘুমিয়ে সেটারই বাস্তবায়ন করে। প্রেমা প্রায়ই ভাবে, প্রীতম আর প্রমীকে নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে

যাবে। কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে বড় কথা, মা অসুস্থ। মাকেও নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু তাকে বেশি নাড়াচাড়া করা ডাক্তারের স্পষ্ট নিষেধ।

প্রেমা হঠাৎ চমকে উঠল। তার কেমন যেন লাগছে। গা গুলিয়ে উঠছে। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। প্রচণ্ড শব্দে ফ্যান ঘুরছে, তবুও তার পা ঘামছে। বুকের ভেতর কী যেন জমাট বেঁধে আছে। কাউকে ডাকা প্রয়োজন। মা, প্রমী দুজনই বেঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বিক্ষিপ্ত একটা অশান্তিতে প্রেমা ঘরময় হাঁটতে শুর করল। আধো আলো, আধো অন্ধকার ঘরে দেয়াল ঘড়ির টিকটিক ছাড়া এ মুহূর্তে আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অফুরন্ত চিন্তা এসে ছড়িয়ে পড়ছে মাথায়। ভবিষ্যতে কী হতে পারে ভাবতেই সে অস্ফুট চিৎকার দিয়ে ওঠে। সমস্ত অশুভ চিন্তা, কষ্ট আর অশান্তি তাকে চারপাশ থেকে কুয়াশার মতো ঢেকে দিচ্ছে। একটা কিছু করা প্রয়োজন কিন্তু কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ভীষণ চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। চোখ ফেটে জল আসতে চাচ্ছে। বুকটা যেন ফেটে চোঁচির হয়ে যাবে। গলার কাছে কী যেন আটকে আছে। প্রেমা ধীরে ধীরে পাশের রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

মা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু তার পরনের শাড়িটা বিশ্রীভাবে হাঁটুর প্রায় কাছাকাছি উঠে আছে। তারপরও সারা মুখজুড়ে অদ্ভুত এক প্রশান্তি খেলা করছে যেন। প্রেমার এ মুহূর্তে তার মাকে খুব সুখী মনে হলো।

ঘরটায় কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ওষুধ অষুধ একটা গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে। মার টেবিল ভর্তি হরেক রকমের ওষুধের বোতল। এ পর্যন্ত কত ডাক্তার যে দেখানো হয়েছে, কত রকম চিকিৎসা করানো হচ্ছে তার হিসেব নেই। কিন্তু তেমন কোনো উন্নতি হচ্ছে না।

মা'র নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে প্রেমার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এই মা-ই তো তাকে পেটে ধরেছিল। কয়েকমাস কষ্ট স্বীকার করে পেটে রেখেছিল। প্রেমার খুব ইচ্ছে করছে মার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করতে, কেন তাকে পেটে ধরেছিল? বাচ্চা পেটে ধরাটা কি খুব আনন্দের, নাকি যন্ত্রণার— কথাটা খুব জানতে ইচ্ছে করে প্রেমার। কিন্তু মা যে কথা বলতে পারে না!

প্রেমা ধীরে ধীরে খাটের পাশে এসে বসল। ধীরে ধীরে মাথাটা নিচু করে মায়ের ডান পায়ে গাল ঠেকিয়ে রাখল। প্রেমার চোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরছে।

প্রেমা মৃদু স্বরে বলল, 'মাগো, আমি এখন কী করব? তুমি বলে দাও মা, আমার এখন কী করা উচিত? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় করছে মা। আমি কার কাছে যাব? কে আমাকে কে সান্ত্বনা দেবে? আমার যে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আমি মরে গেলে তোমাকে, প্রমীকে আর প্রীতমকে

কে দেখবে ? তুমি বলো মা, আমাকে কিছু একটা বলো।'

হঠাৎ শরীরটাকে মোচড় দিয়ে মা অন্যদিকে কাত হয়ে শুয়ে রইল। প্রেমা কথা থামিয়ে দিল। তার একবার মনে হলো, মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসছে না। আসবেও না। এত বেশি দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি নিয়ে কেউ ঘুমাতে পারে ? কত কথা বলার আছে তার। কিন্তু কার কাছে বলবে ? শোনার মানুষ কোথায় পাবে ?

বমি বমি একটা ভাব আসতেই প্রেমা বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করে শব্দ হচ্ছে। দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে সে বসে পড়ল। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। কিন্তু বমি আসছে না। চোখ দুটো ফেটে আসতে চাইছে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর হঠাৎ হড়হড় করে বমি করে ফেলল সে।

বেশ আরাম লাগছে এখন। মুখটা কেমন তিতা তিতা মনে হচ্ছে। ট্যাপটা ছেড়ে দিয়ে মুখ থেকে তিতকুটে ভাবটা সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে কুলি করতে লাগল। তারপর সমস্ত মুখ ধুয়ে বাইরে এল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা আবেশ এসেছে শরীরে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এক দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল প্রেমা। মা কেমন যেন গুনগুন শব্দ করছে। কিছুক্ষণ পরপর মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে। হঠাৎ সামান্য চিৎকার দিয়ে মা কেঁদে উঠল। প্রেমা প্রায় দৌড়ে গিয়ে মাকে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে বলব, 'মা, কী হয়েছে তোমার ? বলো মা, বলো।' কিন্তু মা কোনো কথা বলল না। সামান্যক্ষণের জন্য চোখ দুটো খুলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ মার পায়ের কাছে বসে থাকল প্রেমা। বিভিন্ন চিন্তা মাথায় জট পেকে যাচ্ছে। সমস্যা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। ভাবছে, তার অতিসত্ত্বর কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী করবে, কীভাবে করবে ভেবে পাচ্ছে না। একজন পরামর্শদাতা, খুব আপন, সহমর্মী আর নির্ভরশীল কাউকে তার খুব প্রয়োজন। যে তাকে মুক্ত করবে, সান্ত্বনা দেবে। পরম যত্নে বুকে আগলে রাখবে। সবরকম অশান্তি আর বিশৃঙ্খা থেকে। মার মতো একজন মানুষের প্রচণ্ড অভাব বোধ করছে প্রেমা।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই আবারও ভীষণ কান্না পাচ্ছে প্রেমার। কোথায় পাবে সে মার স্নেহের পরশ ? মা তো অসুস্থ, বোধহীন একটি পাথর। একজন বেঁচে থাকা মৃত মানুষ। মেয়ের এমন চরম বিপদে মা হয়েও কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। প্রেমার ভীষণ ইচ্ছে হয় মাকে চিৎকার করে ডেকে তুলে বলে, 'মা আমাকে বাঁচাও। আমি বাঁচতে চাই মা। আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি আমার হাত ধর। আমাকে জাপটে ধরে তোমার বুকে আগলে রাখ। আমি তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে চাই।'

কিন্তু অপরাগতার অসহায়ত্ব তাকে তাচ্ছিল্য করে। চোখ দিয়ে শ্রাবণের বৃষ্টির মতো পানি ঝরছে। মাথাটা ভোঁতা হয়ে আসছে। একরাশ হতাশা এসে আঁকড়ে ধরে তাকে। আস্তে আস্তে মার পায়ের কাছে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে প্রেমা।

কতক্ষণ এভাবে ছিল বুঝতে পারে না প্রেমা। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই সে চমকে পেছন ফিরে দেখে প্রমী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবলেশহীন চেহারা। কেমন যেন বিষণ্ন, শুকনো। চোখের দিকে তাকাতেই প্রেমা আবার চমকে উঠল। প্রমীর চোখে পানি। প্রেমা দৌড়ে এসে প্রমীকে জড়িয়ে ধরে ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বলে, 'তুই কাঁদছিস ? কেন ?'

প্রমী কোনো কথা বলে না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে প্রেমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে প্রমী। তারপর প্রেমার পেটের ওপর হাত দিয়ে বলে, 'তোমার এমন হলো কেন আপু ?'

চমকে উঠে প্রেমা বলল, 'কী হয়েছে আমার ?'

'আমি সব জানতে পেরেছি আপু। আমি সব বুঝতে পেরেছি।'

প্রেমা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কত কথা বলার আছে। কিন্তু এ মুহূর্তে কী বলবে, কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অবাক হয়ে সে প্রমীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রেমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে প্রমা বলল, 'এখন কী করবে ?'

বিষণ্নভাবে প্রেমা বলল, 'তুই-ই বল।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না আপু।'

হাসি হাসি ভান করে প্রেমা বলল, 'তুই ঘুমিয়ে পড়। দেখিস, আমি সব ঠিক করে নিব।'

'না, আপু, না।' প্রমী কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে আপু ? তুমি চলে গেলে আমরা বাঁচব না! সত্যি বাঁচব না।'

আর সহ্য করতে না পেরে বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়ল প্রেমা। অশ্রুসিক্ত চোখে প্রমীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করেরে বোন।'

'তুমি বাঁচবে আপু, অবশ্যই বাঁচবে।'

'কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করছে। ভয়ঙ্কর রকম ভয়।'

'আপু।' প্রমী খুব শান্ত স্বরে বলল, 'তোমাকে কতদিন কত কথা বলতে চেয়েছি। কতবার ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে সব কিছু জানব। অনেক কথাই হয়েছে কিন্তু জানা হয় নি আসল কথাটাই।'

জল ভরা চোখ নিয়ে দু'বোন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ কিছু বলতে পারে না।

অবশেষে প্রমীই সামলে নিল। বলল, 'তুমি কিচ্ছু ভেব না। সকালেই সব ব্যবস্থা হবে।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, 'দীপ্র ভাইয়াকে একবার বলব ?'

'না।' প্রেমা কঠোরভাবে নিষেধ করে। 'ও বেচারা খুব ভাল মানুষ। এসব শুনলে সে সহ্য করতে পারবে না। আমি সময়মতো পরে ওকে সব বলব।'

'তাহলে এখন কী করবে?'

প্রেমা একটু ভেবে বলল, 'তুই এখানেই থাক। আমি একটা ফোন করব।' এই বলে প্রেমা তার রুমে চলে গেল।

প্রমী এতক্ষণে বিছানার ওপর এলোমেলো ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা তার মায়ের দিকে তাকাল। কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল মায়ের! এখন শুকিয়ে শরীরটা কেমন ছোট হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো অনেক লম্বা ছিল। এখন ছেলেদের চুলের মতো ছোট করে ছাটা। কিছুদিন পরপর মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া হয়। মা এই মুহূর্তে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছে তাকে। প্রমী ভাবে, মা যদি আজ সুস্থ থাকত তাহলে হয়তো আপুর জীবনে এমন দুর্যোগ আসত না।

হঠাৎ 'প্রমী, এ রুমে আয়' প্রেমার কণ্ঠ শুনে ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল তার।

প্রমী মার দিকে শেষবার তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজেদের রুমে গেল। ঘরে ঢুকতেই প্রেমা তাকে কাছে ডেকে বিছানার পাশে বসাল। তারপর বলল, 'তুই এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়। সকালে আমাদের এক জায়গায় যেতে হবে। মা আর প্রীতম যেন ঘুণাক্ষরেও কোনো কিছু জানতে না পারে।'

প্রমী কোনো কথা না বলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

একটা নিশাচর পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে। প্রেমা খুব মনোযোগ দিয়ে পাখিটার ডাক শুনল। পাখির কণ্ঠটা কেমন যেন বিষণ্ন মনে হলো। মনে হলো কাঁদতে কাঁদতে পাখিটা কোথাও যাচ্ছে। আচ্ছা, পাখিরা কি কাঁদে? তার মতো ঐ পাখিটিও কি একা? তারও কি সামনে খুব বিপদ? প্রেমা নিজের মনকেই প্রশ্নগুলো করে কিন্তু কোনো উত্তর পায় না। হাহাকার করা এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে সে শুয়ে থাকে। মায়াবী রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চোখে একফোঁটা ঘুম আসছে না। রাতের অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে অথচ প্রেমার জীবনটা ক্রমশ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ডুবে যাবার উপক্রম। নিজেকে হঠাৎ অপাঙক্তেয় মনে হলো প্রেমার। ধূসর মনে হলো সমস্ত প্রকৃতি। যেন কোথাও কোনো আলো নেই। পৃথিবীর সবাই তার মতো অন্ধকারের বাসিন্দা! প্রবল এক অস্থিরতায় কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রেমার বুকটা। আগ্নেয়গিরির লাভার মতো উত্তপ্ত তরল কিছু যেন বয়ে যাচ্ছে তার বুকের মাঝখান দিয়ে। বাইরে রহস্যময় রাত তার সমস্ত রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আলোর প্রত্যাশায়।

প্রাইভেট ক্লিনিকে ইদানীং বেশ ভালো চিকিৎসা হচ্ছে। কোনো ঝুট ঝামেলা নেই। সব কিছু নিয়ম মাফিক চলে। শুধু টাকা-পয়সাই একটু বেশি লাগে এই যা। কথাটা মনে হতেই দীপ্র নিঃশব্দে হেসে উঠল।

বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে এই ক্লিনিক ব্যবসা এখন বেশ জমজমাট। এখানে এলেই সামান্য জ্বর থেকে শুরু করে যে-কোনো বড় অসুখেই এটা সেটা টেস্ট করতে হয়। ডাক্তারা যে ল্যাবরেটরিগুলো থেকে টেস্ট করতে বলেন সেখান থেকে করালেই সব রিপোর্ট ঠিক, অন্যথায় ঝামেলা। সরকারি হাসপাতালগুলো ঘাস খাওয়া গরুর মাঠে পরিণত হওয়ায় সাধারণ মানুষ হতে শুরু করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাও আজকাল প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা করাচ্ছেন। কেননা রোগ মানেই জীবন-মরণ সমস্যা। তাই টাকার অবাধ নিঃসরণে রোগ ভালো হলেও মধ্যবিত্তের মাথার চুল পড়ে ফাঁকা ময়দান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ক্লিনিক মালিকগুলো ফুলে ফেঁপে একেকজন কোলা ব্যাঙের আকার ধারণ করে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দীপ্র ফুপুর সঙ্গে এ বিষয়েই কথা বলছিল। দীপ্রর ফুপুর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে। ইসিজি করে ডাক্তার সাময়িক একটা ওষুধ দিয়েছে। বলেছেন, তেমন কোনো অসুবিধা নেই। শুধু উত্তেজিত হওয়া, জোরে কথা বলা এবং দুশ্চিন্তা ইত্যাদি দূর করতে হবে। তবুও বেশ কিছু জিনিস টেস্ট করিয়ে তিনদিন পর আবার আসতে হবে।

ফুপুর চেহারাটা কেমন যেন বিধ্বস্থ মনে হচ্ছে। সারারাত নাকি অর্কের কথা ভেবেছেন। দীপ্র কিছুটা আশ্চর্য হয়েছে, কারণ অর্কের বাড়ি পালানোতে ফুপার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ওনার কথা হলো, যদি এ বাড়িতে ওর রিজিক থাকে, তবে সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে কিংবা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, ঠিক ঠিক এখানে ফিরে আসবেই। একটা নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে তিনি খাচ্ছেন, কথা বলছেন, গল্প করছেন। যত চিন্তা, কষ্ট আর ব্যথা— সব যেন একা শুধু ফুপুর।

ফুপুর দিকে এক পলক মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দীপ্র বলল, 'তোমাকে এমন লাগছে কেন?'

সামান্য হেসে ফুপু বললেন, 'কেমন লাগছে রে?'

'সারারাত যে ঘুমাও নি বুঝতেই পারছি। বলো তো, এত চিন্তা করে কী হবে? তুমি দেখো, অর্ক দু একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।'

'শুধু অর্কের জন্য এত চিন্তা করছি না। অরুর জন্যেই আমার যত চিন্তা।'

খুব শান্ত গলায় দীপ্র বলল, 'কেন?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন ফুপু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'মেয়েদের বিয়ের জন্য প্রত্যেক মা-ই অসম্ভব চিন্তা করে। তুই এ বয়সে তা বুঝবি না।'

'ফুপু।' দীপ্র ফুপুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার এত চিন্তা না করলেও হবে। আর অরুর বয়সই বা কত, বিয়ের বয়স তো আর পার হয়ে যাচ্ছে না।'

'ওর যা জিদ, শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে কিনা!'

'করবে। তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। ক'দিন যেতে দাও। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।'

'কারো মতি গতি তেমন বুঝতে পারি না বাবা। কখন যে কী করে বসে। ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়।'

'তোমার দুশ্চিন্তা করা একেবারে নিষেধ। করলে সমস্যা বাড়বে। সুতরাং অযথা চিন্তা করে সমস্যা ডেকে এনো না তো।'

'শুধু অরুটা যদি একটু ঠিক হত, তাহলে আমার এত চিন্তা ছিল না।'

দীপ্র ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে বলল, 'হয়েছে। এ ব্যাপারে আর একটা কথা না।' তারপর ওয়েটিং রুমের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'তুমি এখানে বসো। আমি তোমার রিপোর্ট সম্পর্কে একটু কথা বলে আসি।'

ফুপুকে বসিয়ে দীপ্র ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে যখন বেরিয়ে আসছিল, ঠিক তখনই একজনেকে দেখে ভীষণভাবে চমকে উঠল। প্রথমে ভুল হচ্ছে কিংবা ভুল দেখছে ভেবে পুনরায় ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে না, ঠিকই তো, প্রমী। একটা চেয়ারে বসে আছে। একদৃষ্টিতে টবের একটা পাতাবাহার গাছের দিকে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে নখ খুটছে। দীপ্র এগিয়ে গেল। প্রায় কাছে গিয়ে আবার ভালোভাবে দেখল। তারপর নিশ্চিত হয়ে কপাল কুঁচকে বলল, 'প্রমী, তুমি এখানে?'

ভাবনার প্রকোষ্ঠ থেকে হঠাৎ জেগে উঠল প্রমী। সরাসরি দীপ্রর দিকে তাকাল। খোসা ছাড়া সিদ্ধ ডিমের মতো চোখ, ফ্যাকাশে। অনেক দিনের ক্লান্তি ভর করেছে যেন সে দু'চোখে।

আবার জিজ্ঞেস করল দীপ্র, 'কী হয়েছে প্রমী?'

প্রমী কোনো কথা না বলে মাথাটা নিচু করে ফেলল।

আরো একটু এগিয়ে দীপ্র সরাসরি প্রমীর চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মাথা নিচু করে রাখায় তা সম্ভব হলো না। দীপ্র এবার একটু জোরগলায় বলল, 'প্রমী, কী হয়েছে বলছ না কেন ? তুমি এখানে কেন ?'

প্রমী আগের মতোই নিশ্চুপ। মাথা নিচু থাকা সত্ত্বেও বাঁ হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢাকার চেষ্টা করল।

দীপ্র এবার খুব নরম স্বরে বলল, 'কোনো অসুবিধা, প্রমী ? কী হয়েছে আমাকে বলো, প্লিজ।'

মাথাটা একবার উঁচু নিচু করল প্রমী। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

'কী প্রবলেম ?'

ক্ষমাহীন এক অপরাধীর মতো এবার চোখ তুলে দীপ্রর দিকে তাকায় প্রমী। দু'চোখের জল টলমল করছে গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায়।

প্রায় ধৈর্যহারা হয়ে দীপ্র বলল, 'প্লিজ প্রমী, বলো না কী হয়েছে ?'

প্রমী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটি চেপে ধরল। দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, 'আপু... ।'

কথাটা শেষ করল না প্রমী। মাথাটা নিচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দীপ্র মনে মনে ভয়ঙ্করভাবে হোঁচট খেয়ে থমকে গেল। এ মুহূর্তে কী বলবে তা মাথায় আসছে না। তারপর প্রায় আচমকা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'প্রেমা! প্রেমার কী হয়েছে ?'

কাঁদতে কাঁদতেই প্রমী বলল, 'আমি বলতে পারব না।'

'বলতে পারবে না মানে ? কী হয়েছে ?'

'জানি না।'

'জানো না ?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে দীপ্র বলল, 'প্রেমা কোথায় ?'

'দোতলায় আছে।'

'কখন এসেছ ?'

'খুব সকালে।'

'আর কেউ এসেছে ?'

'না।'

'সিরিয়াস কিছু না হলে কেউ হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে আসে না। আচ্ছা, আমাকে খবর দিলে তো পারতে।'

'আমি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপুই না করল।'

'এখন অবস্থা কেমন ?'

'বোধহয় ভালো।'

'বোধহয় ভালো মানে ?'

'বেশ কিছুক্ষণ হলো আমি এখানে এসেছি। একটা রিপোর্ট নেব। আসার সময় তো বেশ ভালোই দেখলাম।'

'ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।'

দীপ্র দ্রুত পায়ে চলে গেল। ফুপু বসে আছে। তাকে আসতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'কী হলো ?'

'কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা ফুপু, তুমি একা বাসায় যেতে পারবে ?'

'কেন, তুই যাবি না ?'

'না। আমার এক বন্ধু খুব অসুস্থ। এই ক্লিনিকে আছে।'

'তাই নাকি ? ঠিক আছে, তুই একটা রিকশা ডেকে দে, আমি একা যেতে পারব।'

ফুপুকে রিকশায় তুলে দিতেই তিনি বললেন, 'কখন ফিরবি ?'

'তুমি যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বাসায় আসছি।'

'তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু।'

'ঠিক আছে।'

ফুপু চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্র দ্রুত প্রমীর কাছে চলে এলো। মাথায় বিভিন্ন উদ্ভট চিন্তা পাক খাচ্ছে। অস্থির এক উত্তেজনায় কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে।

'প্রমী চলো।'

প্রমীর চোখ লাল হয়ে গেছে। মুখটা অসম্ভব ভার। সে মাথা নিচু করে হাঁটছে। দীপ্র প্রমীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। একটা কেবিনের সামনে এসে প্রমী দাঁড়িয়ে পড়ল। দীপ্র একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'কী হলো ?'

'আপনি ভেতরে যান। আমি বাইরে আছি।'

'সে কী! চলো, একসঙ্গে যাই।'

প্রমী কিছুটা ইতস্ততভাবে কেবিনে ঢুকল। পেছনে পেছনে দীপ্রও। প্রেমা বেডে শুয়ে আছে। খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখছে। কেমন যেন দুঃখী দুঃখী মনে হচ্ছে তাকে। উদাস একটা ভাব তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

'আপু' প্রমী ডাকল।

সামান্য চমকে উঠে মুখে হাসির একটা রেখা টেনে প্রমীর দিকে ফিরে তাকাতেই থমকে গেল প্রেমা। নিমিষেই হাসিটা মিলিয়ে গেল। অন্ধকার একটা ভাব ছড়িয়ে

পড়ল তার চোখে মুখে। শোয়া থেকে উঠে বসার চেষ্টা করতেই ব্যথায় মুখটা কুঁচকে ফেলল। দীপ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'থাক, উঠতে হবে না।'

স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় প্রেমা মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বলল, 'তুমি কখন এলে, দীপ্র ?'

'অনেকক্ষণ।'

'খবর পেলে কোথায় ?'

'খবর দিয়েছ ?'

মাথাটা এদিক ওদিক ঝাঁকিয়ে চোখ দুটো নিচু করে ফেলল প্রেমা। তারপর ম্লান হাসিটুকু কিছুটা দীর্ঘায়িত করে বলল, 'সুখবর সবসময় দেয়া যায়, কিন্তু দুঃখবর নয়।'

'তুমি আমাকে কী ভাব ?'

'আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ।'

'সেই তুমি আমাকে দুঃখের দোহাই দিয়ে কোনো কিছু জানালে না!'

'ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভাবলাম, তোমাকে আবার এই ঝামেলার মধ্যে টেনে এনে লাভ কী ?'

'ঝামেলা! ঝামেলায় কে জড়াতে পারে ? আপনজনই তো আপনজনের ঝামেলায় নিজেকে অংশীদার করতে পারে। কিন্তু তুমি... ?'

'থাক দীপ্র। আমি সত্যি স্যরি।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে দীপ্র বলল, 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী হয়েছে ?'

প্রেমা আড়চোখে প্রমীর দিকে তাকাল। প্রমী মাথা নিচু করে ফেলল। প্রেমা মুখটা ফিরিয়ে সরাসরি দীপ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি জানো না ?'

'জানলে কি কেউ জিজ্ঞেস করে ?'

'প্রমী বলে নি তোমাকে ?'

'না।'

'তাহলে শুনতে চেয়ো না দীপ্র, প্লিজ! কষ্ট পাবে।'

ভীষণ অবাক হয়ে দীপ্র প্রেমার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটা বলে কী ? একটু উত্তেজিত হয়ে সে বলল, 'আমার আর কষ্ট পাওয়ার কিছু বাকি নেই। কষ্ট যা পাবার পেয়ে গেছি।'

'যদি এর চেয়েও বেশি কোনো কষ্ট তোমার জন্য অপেক্ষা করে ?'

'আমি মেনে নেব। কারণ সে শক্তি আমার আছে।'

'দীপ্র।' অপ্রতিভ একটু হেসে প্রেমা বলল, 'মানুষের যত শক্তিই থাক, প্রিয়জনের ধ্বংসিত রূপ সহ্য করার মতো শক্তি খুব কম জনেরই রয়েছে।'

'আমি সেই কম মানুষেরই একজন।'

'মোটেই না। তুমি যে কী তা তো আমি জানি।'

'ওসব থাক। এবার দয়া করে বলো, তোমার কী হয়েছে?'

'তার আগে বলো, তুমি আমার কথা জানলে কী করে?'

'ফুপুকে নিয়ে এই ক্লিনিকে এসেছিলাম। রিপোর্ট আনতে গিয়ে প্রমীর সঙ্গে দেখা।'

'ফুপুর কী হয়েছে?'

'তেমন কিছু না। সামান্য বুকে ব্যথা।'

'ফুপু এখন কোথায়?'

'বাসায় চলে গেছে।'

'একা যেতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ পারবেন।' দীপ্র কিছুটা ধৈর্যহারা হয়ে বলল, 'প্রেমা, এবার প্লিজ বলো, তোমার কী হয়েছে?'

প্রেমা পূর্ণাঙ্গ চোখ মেলে দীপ্রর দিকে তাকাল। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, 'শুনবে? সত্যি শুনতে চাও তুমি, দীপ্র?'

'হ্যাঁ।' খুব আদুরে গলায় দীপ্র বলল, 'বলো।'

একটা অবিশ্বাস্য সত্যের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে প্রেমা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, 'বাচ্চা, অবৈধ বাচ্চা।'

'স্টপ। কী আজেবাজে বকছ।'

নিস্পৃহভাবে প্রেমা ঠিক আগের মতোই বলল, 'আজেবাজে নয় দীপ্র, যা বলছি তারচেয়ে সত্য আর কিছু হয় না।'

'ও গড।' দীপ্র দুহাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে বলল, 'এটা কী করে সম্ভব?'

'সবই সম্ভব, দীপ্র। স-ও-ব।'

'কিন্তু কী করে?'

'শুনে আর কী লাভ বলো? বাদ দাও। তাছাড়া এখন কোনো সমস্যা নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'তুমি এত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছ কীভাবে?'

'কেন, যে মানুষ সমস্ত অস্বাভাবিকতার মাঝে চড়ে বেড়ায়, তার কাছে সব কিছুই স্বাভাবিক। আহ্ দীপ্র, রাখ তো ওসব।'

'না।' জিদের ভাব নিয়ে দীপ্র বলল, 'আমাকে জানতে হবে, আমাকে তুমি সব বলবে।'

'জানতেই হবে ?' প্রেমা দীপ্রর চোখে চোখ রেখে বলল, 'অযথা কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কী বলো তো ?'

'তবুও তুমি বলো প্রেমা।' প্রেমার হাত দুটো ধরে তোর পাশে বসে পড়ল দীপ্র।

'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে দীপ। বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'তবুও বলো প্রেমা। দোহাই।'

কিছুক্ষণ চুপ রইল প্রেমা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে মুখটা ঘুরিয়ে দীপ্রর দিকে তাকাল। প্রমী বেডের অন্য পাশে বসে মাথা নিচু করে চাদরে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি করছে। খুব ধীরে ধীরে প্রেমা দীপ্রর একটা হাত ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'সংসারের প্রয়োজনেই আমাকে টিউশনি করতে হত, এ কথা তুমি শুনেছ। এরকম বেশ কয়েকটা টিউশনির মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলেকেও পড়াতাম। ধনী ফ্যামেলি। প্রতিদিনের মতো একদিন...।'

'আহ্, থামলে কেন, বলো।'

'আমার গা রি রি করছে দীপ্র।'

'বলো'। একটু শান্ত হয়ে বলো।'

'একদিন ঐ বাসায় পড়াতে গিয়ে দেখি ছেলেটা বাসায় একা। ওর মা মার্কেটে গেছে। বাসার কাজের লোকগুলো যার যার মতো রয়েছে। আমি ওকে পড়াচ্ছি, হঠাৎ ওর বাবা এলো। পড়া শেষে আমাকে তার রুমে দেখা করতে বললেন। ভাবলাম ছেলেকে নিয়ে কোনো কথা বলবেন। কিন্তু ঐ রুমে যাবার কিছুক্ষণ পরই আমার গোপন পৃথিবীর সমস্ত পবিত্রতা সে ধ্বংস করে দিল। দীপ্র, তুমি ভাবতে পারবে না, একজন পুরুষ যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, যখন কোনো কিছু সে ধ্বংস করতে চায়।'

'তুমি চিৎকার করতে পারলে না ?'

'সে সুযোগ হয় নি দীপ্র। তাছাড়া একটা মেয়ে চিৎকার করে তার সর্বনাশের কথা কাউকে জানাতে পারে না, যতক্ষণ সে নিজেই চেষ্টা করছে। জানো দীপ্র, আমি ঐ জানোয়ারটার পায়ে পর্যন্ত ধরেছিলাম। কিন্তু সে ছিল অনড়। কীভাবে যে কী হয়ে গেল, আমি আজও ভাবতে পারি না। দীপ্র, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, এই সমাজে অনেক মেয়ে আছে, যারা তাদের সর্বনাশের বোঝা বুকে বয়ে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। না এটা কাউকে বলার, না মুছে ফেলার।'

'তাই বলে তুমি সব কিছু মেনে নিলে ?'

'মেনে নিতে হয় দীপ্র। মেনে নিতে হচ্ছে। আমার জায়গায় অন্যকেউ হলে কী করত জানি না, তবে আমি পারি নি। তাই তো ঐ জানোয়ারটার হাতে আজো আমি জিম্মি। যে আমাকে অত সুন্দর বাসায় রেখেছে, তথাকথিত ফার্স্ট লাইফ উপভোগের সুযোগ দিয়েছে, একটা নিশ্চয়তা দিয়েছে। বিনিময়ে শুধু ওর কথা শোনা, ওর কথায় অন্য আরো কাউকে সুখী করা।'

'তোমার ঘৃণা করে না ?'

'করত। প্রথম ধ্বংসের সূত্রতায় লোকটা আমাকে এ পথে নিয়ে এলো, আমি সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দীপ্র, এটা ভুল না শুদ্ধ সেটা অর্বাচীন, যখন বোঝা যায় সমস্ত সংসারই ধ্বংসের উপক্রম। তাই নিজেকে ধ্বংস করে অন্তত সংসারের আর সবাইকে তো রক্ষা করতে পারছি। ভালো রাখতে পারছি।'

'তবুও এ পথ থেকে তোমার সরে আসতে ইচ্ছে করে না ?'

উদাস হয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রেমা বলল, 'করে। কিন্তু ফিরে এসে কী হবে ? নিজের এই অপবিত্র অস্তিত্ব নিয়ে যেখানেই যাব, সে স্থানটাই পবিত্রতা হারাবে। তাই ভীষণ ভয় করে দীপ্র। তাছাড়া এ পথ ছেড়ে অন্যদিকে যাবার প্রশস্থ পথ কোথায় ? কোথায় পাব সে হাত, যে হাত আমার সমস্ত পঙ্কিলতা মুছে আমাকে জড়িয়ে ধরবে। সব কিছু জেনেও শুদ্ধতার পরশ ছোঁয়াবে আমার প্রাণে ?'

'প্রেমা, প্রেমা শোন, আমি তোমাকে সে পথ দেখাব।'

'তুমি আবেগাক্রান্ত হয়ে কথা বলছ দীপ্র। আবেগ আর বাস্তব দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।'

'এটা আবেগ নয় প্রেমা। সজ্ঞানে বলছি, আমি তোমাকে গ্রহণ করব। শুধু তুমি আমার এ হাতটা ধর, আমি তোমাকে বহুদূরের পথে নিয়ে যাব। তুমি না করো না, প্লিজ।'

ম্লান একটা হাসি দিয়ে প্রেমা বলল, 'দীপ্র, তুমি হয়তো এখন আমাকে গ্রহণ করবে, দুঃখ ভোলাতে চাইবে, কিন্তু সংসারের জটিল ঘুরপাকে একদিন সব কিছু ভাসিয়ে দিবে।'

'না প্রেমা, না। তুমি শুধু একবার হাতটা ধরেই দেখ।'

প্রেমা দীপ্রর একটা হাত ধরে বলল, 'এই ধরলাম।'

'কিছু বুঝতে পারছ ?'

'হ্যাঁ। একজন উদার বন্ধুর ছোঁয়া। একজন ভালো মানুষের স্পর্শ। একজন নির্লোভ মহত্বের ভালোবাসা।'

'তাহলে ?'

'তাহলে তুমি আমার শুধু সেই বন্ধুই। যে আমার সহমর্মিতা, যে আমার দুঃখের দুরতা, যে আমাকে জীবনের বর্ণিল সব আলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। বন্ধুত্বের পরশেই যে পাশে এসে দাঁড়াবে, অন্য কিছুতে নয়।'

'প্রেমা, তুমি আর একবার ভেবে দেখ।'

'আমি খুব ভালোভাবে ভেবেই বলছি দীপ্র। তুমি হয়তো বুঝতে পেরেছিলে, বারবার তুমি ভালোবাসার কথা বললেও আমি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেন জানো ? নিজের অপবিত্রতা নিয়ে অন্য কাউকে ফাঁকি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। তাও আবার তোমার মতো প্রিয় একজন মানুষকে।'

বেশ কিছুক্ষণ দীপ্র কোনো কথা বলল না। অসহ্য কষ্ট হচ্ছে তার। বুকটা কেমন যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে। শিরশির কাঁপুনিতে পুরো শরীর শিহরিত হয়ে উঠছে বারবার। মনে পড়ছে কত স্মৃতি, কত স্বপ্ন, আশা। সারাটা সময়ের প্রতীক্ষা। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল দীপ্র। সব কিছু তার কাছে কেমন যেন ঝাঁপসা ঠেকছে। অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া। বিবর্ণ।

'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে দীপ্র। আমাকে ক্ষমা করো।'

'যাই প্রেমা।' বলেই দীপ্র উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে হেঁটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে প্রেমা ডাকল, 'দীপ্র।'

খুব ধীরে ধীরে দীপ্র ঘুরে দাঁড়াল। বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। রক্তের গতি মনে হচ্ছে সাইক্লোনের বেগে চলছে। প্রেমার দু'চোখ সাগরের মতো ভেজা। দু'গাল বেয়ে সেই ভেজাগুলো গলে গলে পড়ছে।

'একটা কথা বলব দীপ্র। আজ আমার খুব আনন্দ লাগছে। নিজেকে আজ খুব ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে, কারণ তুমি আমাকে ভালোবেসেছ। তোমার মতো একটি পবিত্র সুন্দরের কাছ থেকে আমি ভালোবাসা পেয়েছি, এ আমার সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া হয়ে থাকবে।'

আবার ঘুরে দাঁড়াল দীপ্র। অসম্ভব শান্ত মনে হচ্ছে সব কিছু। স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে চারিদিক। বিষণ্নতায় ডুবে যাচ্ছে প্রকৃতি। অন্তহীন এক কষ্ট নিয়ে দরজা খুলে বাইরে দাঁড়াল দীপ্র। বাইরে হাহাকার করা শূন্যতা। নিথর গাছপালা। রোদে পুড়ে যাচ্ছে সবুজ পাতা। কোথাও কোনো বাতাস নেই। অক্সিজেনের অভাবে দীপ্রর হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

শেষ বিকেলে বাসায় ফিরল দীপ্র। ক্লিনিক থেকে বের হয়ে অনেক পথ ঘুরেছে। অনেক জায়গায় বেড়িয়েছে, কিন্তু একটুক্ষণের জন্যও স্থির হতে পারে নি কোথাও। বুকের ভেতরের এক নিঃশব্দ হাহাকার তাকে তাড়া করেছে সারাক্ষণ।

ঘরে ঢুকেই মার মুখোমুখি। তিনি বললেন, 'জানিস, অর্ক ফিরেছে।' পরক্ষণেই দীপ্রর দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে বললেন, 'কিরে, তোকে এমন লাগছে কেন ?'

'এমনি। সারাদিন বাইরে ছিলাম তো।'

'খাওয়া দাওয়া করেছিস ?'

দীপ্র কিছু বলার আগেই শিলা দৌড়ে এসে বলল, 'জানো ভাইয়া, অর্কের কী হয়েছে ? ও যে টাকাগুলো নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো নাকি একটা লোককে দেয়ার কথা ছিল। সেই লোক নাকি ওকে সিনেমায় চান্স দেবে। সিনেমা করলে নাকি অনেক টাকা পাওয়া যায়।'

'অর্ক কোথায় ?'

'আগে শোনই না কী হয়ছে। অর্ক ঐ লোকটার বাসা খুঁজে না পেয়ে রাতে একটা মসজিদের বারান্দায় শুয়েছিল। ভেবেছিল সকালে উঠে আবার খুঁজবে। হঠাৎ মাঝরাতে পাঞ্জাবি ও টুপি পরা এক লোক এসে ওকে বলল, 'আমি এই মসজিদে থাকি। তোর কাছে টাকা আছে, আমাকে দিয়ে দে। কাল সকালে নিয়ে নিস। এখানে অনেক আজেবাজে লোক থাকে। তোর টাকা চুরি হয়ে যাবে।' খিলখিল করে হাসতে হাসতে শিলা বলতে থাকল, 'বোকাটা করেছে কী জানো, টাকাগুলো ঐ লোকটাকে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সকালে উঠে দেখে লোকটা হাওয়া। ভাইয়া, আরো মজার ঘটনা শোন, অর্ক বাড়ি ফিরবে কী করে ? খাবে কী ? তাই সে নাকি দু'একজনের কাছ থেকে ভিক্ষাও নিয়েছে। অবশেষে কোনো এক চেনা লোক নাকি ওকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। হি হি হি।'

'ঠিক আছে, আমি ওর সঙ্গে পরে কথা বলব।'

'ভাইয়া, তোমার কি মন খারাপ ?'

'না।'

এমন সময় ফুপু ঘরে ঢুকে বললেন, 'কিরে, তোর বন্ধুর খবর কী ?'

'ভালো।'

'কী হয়েছিল ?'

'তেমন কিছু না।'

'জানিস তো, অর্ক ফিরেছে ?'

'হ্যাঁ, শুনলাম।'

'ওকে এবার একটু শাসন কর। আমি আর কিছু বলব না।'

দীপ্র অর্কর রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে অনেকগুলো তারা উঠেছে। এক টুকরো মেঘের নিচে চাঁদটা ঢেকে আছে। হঠাৎ দরজায় খুট করে শব্দ হলো। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে অরু।

'অরু ?'

'হ্যাঁ। আলো জ্বালো নি যে ?'

'থাক, অন্ধকারেই ভালো লাগছে।'

ক্ষণিক চুপ থেকে অরকীয়া বলল, 'তোমার পাশে একটু বসব ?'

পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে আধো অন্ধকারেই অরকীয়াকে দেখে দীপ্র বলল, 'বোস।'

অরকীয়া দীপ্রর মাথার কাছে বসে বলল, 'তোমার কী হয়েছে ?'

'কই, কিছু না তো।'

'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।'

'আমার কথা বলতে ভালো লাগছে নারে। বড্ড মাথা ধরেছে।'

সামান্য ইতস্তত করে অরকীয়া ওর ডান হাতটা দীপ্রর কপালে রাখল। ঘাড় ফিরিয়ে অরকীয়ার দিকে তাকিয়ে গভীর একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল দীপ্র। আস্তে আস্তে ওর বাঁ হাতটা উঠে এলো কপালের ওপর রাখা অরুর ডান হাতের উপর। একটু যেন চমকে উঠল অরু। তারপর হঠাৎ, যেন কিছু না বুঝেই একটু ঝুঁকে ওর কপালটা রাখল দীপ্রর হাতের উপর।

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল দীপ্র। মেঘটা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আশ্চর্য আলো নিয়ে চাঁদটা বেরিয়ে আসছে মেঘের কোল থেকে। সোনালি আলোয় ভরে যাচ্ছে প্রকৃতি। জানালা দিয়ে চাঁদ তার উপচে পড়া জোছনায় ভাসিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে। আকাশছোঁয়া মুগ্ধতা নিয়ে দীপ্র সেদিকে তাকিয়ে রইল।